গবেষণা সিরিজ-৭

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?

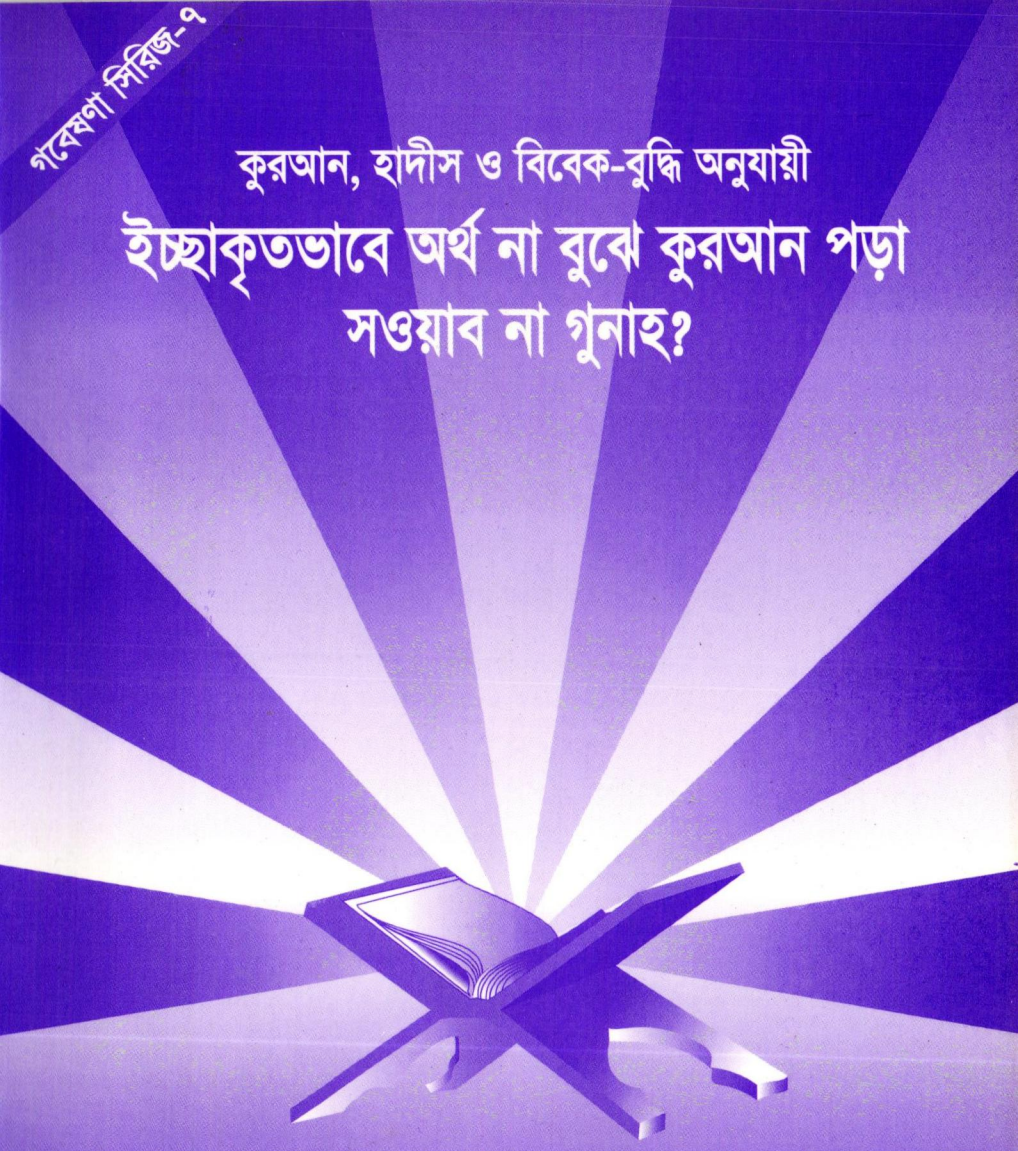

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F. R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (QRF)

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com
E-mail
quran.research.foundation
@gmail.com
Phone : 02-9341150

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০০
পঞ্চম সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ৩২.০০ টাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ:	৭
৩.	যে ফর্মুলা অনুযায়ী উৎস তিনটি বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে	১৫
৪.	গোড়ার কথা	১৭
৫.	ইসলামী জীবন বিধানে করণীয় কোন কাজের ব্যাপারে গুনাহ্ হওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ ও শর্ত	১৮
৬.	না জানতে পারার কারণে আমল না করলে গুনাহ হবে কিনা?	১৯
৭.	ইসলামের বিভিন্ন কাজ থেকে বিপথে নেয়ার শয়তানের কর্মপদ্ধতি	২০
৮.	বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ	২৪
৯.	আল-কুরআন অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ্	২৫
৯.	অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি কথাটি কুরআনে থাকা সম্ভব কি না	৪২
১০.	আল-হাদীস অনুযায়ী অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ্	৪৫
১১.	আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের সার সংক্ষেপ	৫৪
১২.	অর্থ না বুঝে কুরআন পড়ার ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৫
১৩.	না জানার দরুন অতীতে যারা অর্থ না বুঝে কুরআন পড়েছে তাদের অবস্থা ও করণীয়	৫৬
১৪.	কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে মুসলমানদের বেশী করে আকৃষ্ট করার জন্য করণীয়	৫৭
১৫.	শেষ কথা	৬১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের

প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন রবে, তাদের তা করা হবে না)।তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি ।তাইকুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন

অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন মজীদ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ২৫.১১.১৯৯৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا– فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا– وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا–

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে।এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ.اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.)

তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।
(বুখারী ও মুসলিম)
হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।
(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,
গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,
ঘ. অল্পকিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তন-ভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ইসরা বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের

তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

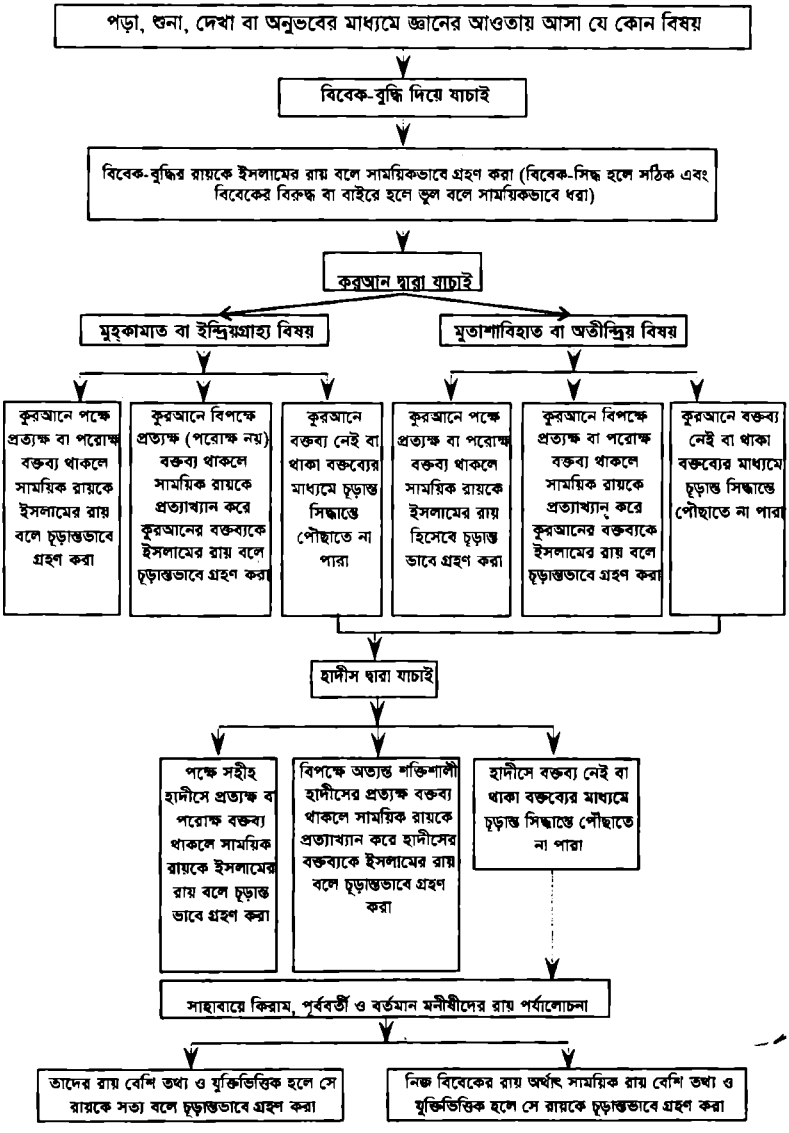

গোড়ার কথা

অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি-কথাটা প্রায় সকল মুসলমান জানে এবং মানে। যারা অর্থসহ বা বুঝে কুরআন পড়ে তাদেরও প্রায় সবাই এটা বিশ্বাস করে যে, কুরআন না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি হয়।

না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি-কথাটা কুরআনকে শুধুমাত্র অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়ার অনুমতিই দেয় না বরং তা, না বুঝে কুরআন পড়াকে উৎসাহিত করে। আর এই কথাটার প্রভাবে বর্তমানে সারা বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ছে। আর তারা তা করছে এটা ভেবে যে-

১. অর্থ ছাড়া পড়লেই যখন প্রতি অক্ষরে দশ নেকি পাওয়া যায়, তখন আর কষ্ট করে অর্থ বুঝতে যাওয়ার দরকার কি ?
২. অর্থ পড়তে বা বুঝে পড়তে গেলে, না বুঝে পড়ার তুলনায় একই সময়ে কম অক্ষর পড়া হবে। ফলে সওয়াবও কম পাওয়া যাবে।

আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সকল মু'মিন বা মুসলমানের ১ নং আমল বা কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে মুমিন বা মুসলমানকে দূরে রাখা। অর্থাৎ ইসলামী জীবন বিধানে সকল মুমিন বা মুসলমানের জন্যে সব চেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সব চেয়ে বড় গুনাহের কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করা বা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মু'মিনের ১ নং কাজ কোনটি এবং শয়তানের ১ নং কাজ কোনটি' নামক বইটিতে।

না বুঝে কুরআন পড়ার অর্থ হচ্ছে, কুরআন পড়া কিন্তু তার জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। তাই এ কথা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি কথাটি ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজকে দারুণভাবে সাহায্য করছে। সুতরাং কথাটি সঠিক কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করি।

বিষয়টি নিয়ে কুরআন ও হাদীস অনুসন্ধান করে যে তথ্য পেয়েছি, সেগুলো মুসলমান জাতির নিকট উপস্থাপন করাই এ পুস্তিকা লেখার উদ্দেশ্য। আশা করি তথ্যগুলো জানার পর সকল পাঠক জানতে পারবেন,

অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ার বিপক্ষে বা পক্ষে কী কী তথ্য কুরআন ও হাদীসে আছে। ফলে তারা অতি সহজে বুঝতে পারবেন, অর্থ তথা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ হবে, না সওয়াব হবে। আর এর ফলে একজন পাঠকও যদি অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া ছেড়ে দিয়ে অর্থসহ বা বুঝে কুরআন পড়া আরম্ভ করে তবে আমার এ চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব।

ইসলামী জীবন বিধানে করণীয় কোন কাজের ব্যাপারে গুনাহ হওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ ও শর্ত

ইসলামী জীবন বিধানে করণীয় কোন কাজের ব্যাপারে গুনাহ হওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ ও শর্ত হচ্ছে-

কারণ -

১. কাজটি না করা।
২. কাজটির বিপরীত কাজ করা।
৩. আল্লাহ এবং রাসূল (স.) যে পদ্ধতিতে করতে বলেছেন, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি রেখে কাজটি করা। কারণ, পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ বা মৌলিক ত্রুটি থাকলে যে কোন কাজ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শর্ত

১. ইচ্ছাকৃতভাবে উপরের তিনটি কারণ সংঘটিত হতে হবে।
২. ওজরের জন্য তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন আমল ছেড়ে দিলে বা তার বিপরীত কাজ করলে গুনাহ হয় না যদি নিম্নের শর্তগুলো পূরণ হয়-
   ক. ওজরের গুরুত্ব ছেড়ে দেয়া আমলটির গুরুত্বের সমান হলে। অর্থাৎ মৌলিক আমল ছাড়তে হলে অত্যন্ত বড় বা মারাত্মক ওজর থাকতে হবে। আর অমৌলিক আমল ছাড়ার ব্যাপারে ছোট-খাট ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে।
   খ. মনে অনুশোচনা, অশান্তি, দুঃখ ইত্যাদি থাকতে হবে এবং তার পরিমাণ ছেড়ে দেয়া আমলটির গুরুত্বের সমান হতে হবে। এই অনুশোচনা, অশান্তি, দুঃখই প্রমাণ করে

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে আমলটি ছাড়ছে না।

গ. যে অবস্থার জন্যে আমলটি ছাড়তে হচ্ছে বা পালন করতে পারা যাচ্ছে না তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার পরিমাণ ছেড়ে দেয়া আমলটির গুরুত্বের সমান হতে হবে। আর চেষ্টাই প্রমাণ দিবে যে ব্যক্তি খুশী মনে বা ইচ্ছাকৃভাবে আমলটি ছাড়ছে না, ওজরের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে ছাড়ছে। কারণ, কোন বিষয়ের জন্য ব্যক্তির মনে অনুশোচনা, অশান্তি, দুঃখ ইত্যাদি থাকলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা সে অবশ্যই করবে।

এই তিনটি শর্ত যথাযথভাবে পূরণ না করে এক বা একাধিক আমল যে ব্যক্তি ছেড়ে দিবে ইসলামী জীবন বিধানে তাকে গুনাহ্গার বলা হয়। আর যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে ইসলামের কোন একটি আমলে সালেহ ছেড়ে দিবে, সে কাফির বা মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ' নামক বইটিতে।

না জানতে পারার কারণে কোন আমল না করলে গুনাহ্ হবে কিনা

ইসলামের করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ কোনগুলো, তা যেন কারো অজানা না থাকতে পারে সে জন্যে-

১. কুরআন ও সুন্নাহ ঘোষণা করেছে, সকলের জন্য সব চেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সব চেয়ে বড় গুনাহের কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা।

২. যাদের কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান আছে তাদের জন্য-

ক. সে জ্ঞান অন্যের নিকট পৌছানোকে একটা বড় সওয়াবের কাজ হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ বারবার ঘোষণা করেছে।

খ. গুরুতর কোন কারণ ছাড়া সে জ্ঞান অন্যকে না পৌছালে বা গোপন করলে কঠিন শাস্তির ঘোষণাও কুরআন ও সুন্নাহ বারবার দিয়েছে।

তাই অজানা অবস্থায় ইসলামের করণীয় কোন কাজ না করলে বা নিষিদ্ধ কোন কাজ করলে প্রত্যক্ষভাবে গুনাহ না হলেও পরোক্ষভাবে গুনাহ হয়। কারণ ইসলামে কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করাই সব চেয়ে বড় গুনাহের কাজ। এই পরোক্ষ গুনাহ যাতে না হতে পারে সে জন্যেই-

১. পৃথিবীর প্রথম মানুষটিকে নবী করে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ কোনটা করণীয় এবং কোনটা নিষিদ্ধ, তা তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

২. পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিকট আল্লাহ নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন •

(নহল:৩৬)

৩. কোনটা করণীয় আর কোনটা নিষিদ্ধ, তা জানিয়ে কিতাব ও সহিফা পাঠানো হয়েছে।

তবে যে ব্যক্তি সুযোগের অভাবে লেখাপড়াই শিখতে পারেননি, তিনি যে এই পরোক্ষ গুনাহ্ থেকে বেঁচে যেতে পারেন, আর যিনি বড় বড় বই পড়ে নানা বিষয়ে শিক্ষিত হয়েছেন কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেননি, তিনি যে কোনভাবেই এই পরোক্ষ (তবে মারাত্মক) গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবেন না। তা সহজেই বুঝা যায়।

❑❑ আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ইসলামের সবচেয়ে বড় আমল বা কাজ। তাই আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারেও উপরোক্ত কারণ ও শর্ত অনুযায়ী গুনাহ হবে বা হয়।

ইসলামের বিভিন্ন কাজ থেকে বিপথে নেয়ার শয়তানের কর্মপদ্ধতি

উপরের আলোচনার পর এ কথা অতি সহজে বলা ও বুঝা যায় যে, ইসলামের করণীয় কাজ থেকে মুসলমানদের বিপথে নেয়ার জন্যে শয়তানের ষড়যন্ত্রের প্রধান কৌশলগুলো হবে-

১. মুসলমানরা কাজটা যাতে না করে বা তার বিপরীত কাজ করে সে জন্যে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা।

এই পদ্ধতিতে মুসলমানদের বিপথে নেয়া একটু কঠিন। কারণ, আল্লাহ ও রাসূল (স.) যে কাজটি করতে বলেছেন, সেটা সরাসরি না করতে বললে বা তার বিপরীত কাজ করতে বললে, তা গ্রহণ

করতে মুসলমানরা সাধারণত দ্বিধায় পড়ে যায়। তবুও শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে পদ্ধতিটা প্রয়োগ করেছে এবং অনেকাংশে সফলকামও হয়েছে। তাই তো দেখা যায়, আজ অনেক মুসলমান ইসলামের অনেক মৌলিক কাজও করা থেকে বিরত আছে বা অনেক মৌলিক কাজের বিপরীত কাজ করছে।

২. কাজটা আল্লাহ্ যে নিয়মে বা পদ্ধতিতে করতে বলেছেন এবং রাসূল (স.) যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে ভিন্নভাবে করানোর জন্যে সব ধরনের ষড়যন্ত্র করা।

শয়তানের প্রথম ষড়যন্ত্রের কৌশল উপেক্ষা করে যে সকল মুসলমান ইসলামের কোনো কাজ করতে এগিয়ে যায়, এই দ্বিতীয় কৌশল খাটিয়ে সে তাদের বিপথে নেয়ার চেষ্টা করে। এ পদ্ধতিটা খুব কার্যকর হয়। কারণ, মুসলমানরা কাজটা করছে বলে খুশি থাকে। আর পদ্ধতিটা এমন সূক্ষ্মভাবে ঘুরিয়ে দেয়া হয় যে, ভালো জ্ঞান না থাকলে তা ধরাও যায় না। যে কোনো কাজের ফল (Result) নির্ভর করে কাজটি করার পদ্ধতির উপর। কাজটি যেহেতু আল্লাহর পদ্ধতি অনুযায়ী হয় না, তাই ঐ কাজের দ্বারা আল্লাহ যে ফল দিতে চেয়েছিলেন তাও ফলে না বরং শয়তান যে ফল চেয়েছিল, তাই ফলে।

শয়তানের এই সূক্ষ্ম পদ্ধতির শিকার হয়ে বিশ্ব মুসলমানদের অধিকাংশই বর্তমানে ইসলামের অনেক মৌলিক কাজও এমনভাবে করছে যেটা আল্লাহর বলা ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত পদ্ধতি নয়। তাই, তারা ঐ কাজগুলোর ইহকালীন অপূর্ব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এর ফলে মানব সভ্যতাও ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। ঐ কাজগুলোর পরকালীন কল্যাণ থেকেও যে তারা বঞ্চিত হবে,তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে নেয়া হচ্ছে শয়তানের এক নম্বর কাজ। তাই এ কাজে সফল হওয়ার জন্যে সে তার ধোঁকাবাজির সকল পদ্ধতি খাটাবে, সেটাইতো স্বাভাবিক। আর এখানেও সে অবিশ্বাস্যভাবে সফলকাম হয়েছে, সেটাও তো অতি সহজে বুঝা যায়।

বিপথে নেয়ার পদ্ধতিগুলো সহজে গ্রহণ করানোর জন্য

শয়তানের সাধারণ কর্মকৌশল

মুসলমানরা যাতে বিভিন্ন ধোঁকাবাজি সহজে গ্রহণ করে তার জন্যে শয়তান এক অপূর্ব সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করেছে। কৌশলটা কী তা সহজে বুঝতে হলে কুরআন থেকে সৃষ্টির গোড়ার কিছু কথা জানতে হবে।

আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ সকল ফেরেশতা ও জিন ইবলিসকে ডেকে আদম (আ.)কে সিজদা করতে বললেন। সমস্ত ফেরেশতা সিজদা করল কিন্তু ইবলিস নিজে আগুনের তৈরি তাই আদম (আ.) থেকে নিজকে শ্রেষ্ঠ ভেবে অহংকার করে, সিজদা করল না। আদেশ অমান্য করার জন্য ইবলিসের প্রতি আল্লাহ্ রাগান্বিত হলেন এবং তাকে অভিশপ্ত করে শয়তান হিসাবে ঘোষণা দিলেন। ইলিসের সমস্ত রাগ তখন যেয়ে পড়ল আদম (আ.) এর তথা মানুষের উপর। কারণ মানুষের কারণেই তাকে অভিশপ্ত হতে হল। তাই মানুষকেও বিপথে নিয়ে অভিশপ্ত করার সব ধরনের চেষ্টা সে করবে বলে ঠিক করল। শয়তানের এই কথাটা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

অর্থ: সে (ইবলিস) বলল, হে আমার রব, তুমি (আদমের মাধ্যমে) আমার যে সর্বনাশ করলে, তার শপথ করে বলছি, পৃথিবীতে পাপ কর্মকে আমি মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলব এবং তাদের সকলকে অভিশপ্ত করে ছাড়ব।

(আল হিজর/১৫:৩৯)

ইবলিসের এ কথার জবাবে আল্লাহ তাকে বলে দিলেন, তুই কেবল ধোঁকা দিয়ে মানুষকে বিপথে নেয়ার চেষ্টা করতে পারবি। শক্তি খাটিয়ে তাদের বিপথে নিতে পারবি না। ইবলিস তখন নিশ্চিত হল যে, 'ধোঁকাবাজির মাধ্যমে' তাকে সকল কাজ করতে হবে। আর এই 'ধোঁকাবাজি' মানুষ যাতে সহজে গ্রহণ করে তার জন্য একটা সাধারণ কর্মপন্থাও তাকে বের করতে হবে। ইবলিসের সেই সাধারণ পন্থা (Common strategy) হচ্ছে, কল্যাণ, লাভ বা সওয়াবের লোভ দেখিয়ে

ধোঁকা দেয়া। কুরআন পড়ার ব্যাপারেও ইবলিস মুসলমানদের সওয়াবের কথা বলে নানাভাবে ধোঁকা দিয়েছে।

শয়তানের ধোঁকা নামক কৌশলের প্রথম প্রয়োগ

ইবলিস তার ধোঁকার কৌশলের অর্থাৎ সওয়াব বা কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেয়া কৌশলের, প্রথম প্রয়োগ করে বেহেশতে, হযরত আদম (আ.) এর উপর। পবিত্র কুরআনে বর্ণনাকৃত সে ঘটনাটি নিম্নরূপ-

আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে বেহেশতে থাকতে দিলেন এবং যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যা ইচ্ছা খেতে বললেন। তবে একটা বিশেষ গাছের ফল খেতে এমনকি তার ধারে কাছে যেতেও তাঁদের নিষেধ করে দিলেন। শয়তান তখন বুঝতে পারলো, যদি আদম (আ.) এর ক্ষতি করতে হয় তবে তাকে যে কোনোভাবে ঐ নিষিদ্ধ গাছের কাছে নিতে বা তার ফল খাওয়াতে হবে। সে তখন তার সাধারণ কৌশল অর্থাৎ কল্যাণের কথা বলে ধোঁকা দেয়ার কৌশল প্রয়োগ করল। আদম (আ.) কে সে বলল, তুমি তো জানো না, আল্লাহ কেন তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। ঐ গাছের ফল খেলে তোমরা ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবে এবং চিরকাল বেহেশতে থাকতে পারবে। তাই আল্লাহ্ তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কল্যাণ বা লাভের কথা শুনে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেলেন। তাঁরা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। ধোঁকায় পড়ে হলেও এতে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা হয়। তাই আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে বেহেশতের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। তারপর তাঁরা ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করলে তাঁদেরকে মাফ করে দেয়া হয় এবং আল্লাহ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, শয়তান তার কল্যাণের কথা বলেই ধোঁকা দেয়ার সাধারণ কৌশলের প্রথমপ্রয়োগ করে এবং তাতে সে কৃতকার্যও হয়।

উপরের তথ্যগুলো জানার পর চলুন এখন কুরআনকে, অর্থসহ বা অর্থ ছাড়া পড়ার ব্যাপারে বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যসহ বা ছাড়া পড়ার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

মূল বিষয়

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ

তথ্য-১

আল-কুরআন, কোনো গল্প, কবিতা বা গজলের কিতাব নয়। আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত একখানা ব্যবহারিক (Applied) কিতাব। আর সওয়াব কথাটার অর্থ হচ্ছে কল্যাণ। কোনো ব্যবহারিক কিতাব পড়ার স্বতঃসিদ্ধ উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার জ্ঞান অর্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে নিজে কল্যাণপ্রাপ্ত হওয়া এবং অপরকে কল্যাণপ্রাপ্ত করা। কেউ যদি কোনো ব্যবহারিক কিতাব এমনভাবে পড়ে, যাতে ঐ কিতাবের জ্ঞান অর্জন হয় না (অর্থাৎ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়ে) এবং তারপর ঐ কিতাবের বক্তব্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে যায়, তবে অবধারিতভাবে সে মারাত্মক মারাত্মক ভুল করবে। নিজের ওপর ঐ জ্ঞান প্রয়োগ করলে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর অন্যদের উপর তা প্রয়োগ করলে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাকে পুরস্কার দেয়াতো দূরের কথা শাস্তি দিবে। তাহলে বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য (Universal truth) রায় হচ্ছে, জ্ঞান অর্জন হয় না এমনভাবে বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কোনো ব্যবহারিক কিতাব পড়লে কোনো কল্যাণ বা সওয়াব হয় না। বরং ক্ষতি বা গুনাহ হয়। আল-কুরআন যেহেতু একখানা ব্যবহারিক কিতাব, তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এ কিতাবও ইচ্ছাকৃতভাবে, অর্থ বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া পড়লে, সওয়াব না হয়ে গুনাহ হওয়ার কথা।

তথ্য-২

কোন কাজ যদি এমনভাবে করা হয় যে, তাতে তার উদ্দেশ্যটি কোনভাবেই সাধিত হবে না, তবে যে সময়টুকু কোন ব্যক্তি ঐ কাজে ব্যয় করবে, সে সময়টা অবশ্যই নষ্ট হবে অর্থাৎ তার অন্তত সময় অপচয়ের ক্ষতি হবে।

আল-কুরআন পড়ার প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা এবং দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে কুরআন পড়ার প্রথম স্তরের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। এ

দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া ব্যক্তির সময় অপচয়ের ক্ষতি যে হবে, তা দৃঢ়ভাবে বলা যায়।

আল-কুরআন অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ

কুরআন থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো নিয়ম-

১. ঐ বিষয়ে কুরআনে যতোগুলো আয়াত বা বক্তব্য আছে, সে সকল বক্তব্যকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, একটি আয়াতে বিষয়টির একটি দিক এবং অন্য আয়াতে তার আর একটি দিক বা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আর অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য ইবনে কাছির, ইবনে তাইমিয়াসহ সকল মনীষীই বলেছেন, কুরআনের শ্রেষ্ঠ তাফসীর (ব্যাখ্যা) হচ্ছে, কুরআন।

২. একটি বিষয়ে কুরআনের কোনো আয়াতের বক্তব্যের যদি অস্পষ্টতা থাকে এবং ঐ বিষয়ে যদি অন্য কোনো স্পষ্ট আয়াত থাকে, তবে অস্পষ্ট আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা স্পষ্ট আয়াতটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, (পরে আসছে) কুরআনে বিপরীতধর্মী কোনো কথা নেই।

চলুন এখন কুরআন অর্থসহ বা ছাড়া অর্থাৎ বুঝে বা না বুঝে পড়ায় সওয়াব বা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে আল-কুরআনের তথ্যসমূহ আলোচনা করা যাক-

তথ্য-১

কুরআন পড়ার কথাটি বলতে বা বুঝাতে যেয়ে মহান আল্লাহ আল-কুরআনে মাত্র তিনটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে-

قِرَأَةَ – تِلَاوَةَ – رَتَّلَ

এ শব্দ তিনটির প্রত্যেকটির আরবী অভিধান অনুযায়ী একটি মাত্র অর্থ হয়। সে অর্থটি হচ্ছে, অর্থ বুঝে পড়া বা বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করা।

আরবী অভিধানে এ শব্দ তিনটির অর্থ, না বুঝে বা অর্থ ছাড়া পড়া অতীতে কখনই ছিল না, বর্তমানে নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

কুরআনের আয়াতের তরজমা করার সর্বসম্মত নিয়ম হচ্ছে একটি শব্দের যদি একটি মাত্র অর্থ আরবী ভাষায় হয়, তবে ঐ আয়াতের তরজমা ও ব্যাখ্যা করার সময় সে অর্থটিই গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোন রকম অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

এ সর্বসম্মত ও ১০০% বিবেক-সিদ্ধ রায় অনুযায়ী তাহলে কুরআনের যে সকল আয়াতে শব্দ তিনটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে অর্থসহ বুঝে বুঝে পড়া বা অধ্যয়ন করা ধরে তরজমা ও ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্য কথায় সেখানে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়া ধরে তরজমা বা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগই উসুলে তাফসীরে নেই। বিশেষ করে ৩:৯৩, ৩:১০১, ৮:২ আয়াত কয়টি অধ্যয়ন করলে তিলাওয়াত শব্দের অর্থের মধ্যে বুঝার বিষয়টি যে নিহিত আছে তা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝা যায়।

তথ্য-২

إِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

অর্থ: পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (আলাক/৯৬: ১)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা হিসেবে বুঝে বুঝে পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন অথবা না বুঝে বুঝে পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, এ দুটি কথা উপস্থাপন করে পৃথিবীর মানুষকে যদি কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষ বলবেন, প্রথমটি সঠিক এবং দ্বিতীয়টি ভুল। শুধুমাত্র ১০০% পাগল ব্যক্তি বলতে পারে দ্বিতীয়টি সঠিক এবং প্রথমটি ভুল। তাই নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায় আল-কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে দেয়া মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশটি হচ্ছে, 'বুঝে বুঝে পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন'।

আয়াতে কারীমার বক্তব্যটি আদেশমূলক। তাই যারা ইচ্ছাকৃভাবে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ছেন, তারা মহান আল্লাহর নাযিলকৃত প্রথম ও সরাসরি (Dircet) আদেশটিই অগ্রাহ্য করছেন অর্থাৎ তারা বড় গুনাহের কাজ করছেন এটি নিশ্চয়তা সহকারেই বলা যায়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন নাযিল হওয়ার ১৪০০ বছর পর আজ সহজ একটা বাক্যের অত্যন্ত সহজ একটা ব্যাখ্যা আবার নতুন করে বিশ্ব মুসলমানদের জানাতে ও বুঝাতে হচ্ছে। আরো অবাক ব্যাপার, কুরআন যারা অর্থ ছাড়া পড়েন তারা কিন্তু অন্য কোন বই অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়েন না। শয়তানের ধোঁকার কাছে কী বিস্ময়করভাবে তারা হেরে গেছেন, তাই না?

তথ্য-৩

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِه أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه ط

অর্থ: আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্য থেকে) যারা তা 'হক' আদায় করে তিলাওয়াত করে, তারাই ঐ কিতাবকে বিশ্বাস করে। (বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখ্যা: এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে হলে বা এর সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে, 'তিলাওয়াতের হক' কী কী? অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায়, কোন গ্রন্থ, বিশেষ করে আল্লাহর কিতাবের ন্যায় ব্যবহারিক (Applied) গ্রন্থ পড়ার প্রধান চারটি হক হচ্ছে-

ক. শুদ্ধ করে পড়া,
খ. অর্থ বুঝা অর্থাৎ তার জ্ঞান অর্জন করা,
গ. সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল বা কাজ করা,
ঘ. সে জ্ঞান অন্যকে জানানো তথা দাওয়াত দেয়া।

বাস্তবে দেখা যায়, কিতাবধারীদের অনেকেই ঐ হকসমূহ আদায় করে তাদের উপর নাযিল হওয়া কিতাব তিলাওয়াত করেন না। অর্থাৎ কেউ তিলাওয়াতের হক আদায় করে, আর কেউ কেউ তা না করে তাদের কিতাব তিলাওয়াত করেন। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই মহান আল্লাহ্ এ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে বলেছেন, যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তাদের উপর নাযিল হওয়া কিতাব তিলাওয়াত করে, তারাই ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে অর্থাৎ তারাই মু'মিন। তাহলে যে সকল শর্ত অনুযায়ী কুরআনের কোন বক্তব্য আমান্য করলে গুনাহ হয় (১৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে), সেগুলোকে সামনে রাখলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যারা

ইচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াতের হক আদায় না করে, কিতাব তিলাওয়াত করে, তারা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে নাই। অর্থাৎ তারা কুফরীর গুনাহে গুনাহগার। সুতরাং আল্লাহ এখানে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, কিতাবধারীদের মধ্যে যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) উপরে উল্লেখিত চারটি হকের একটিও আদায় না করে, কিতাব তিলাওয়াত করে বা করবে, তারা কুফরীর গুনাহে গুনাহগার হবে।

এবার চলুন উল্লেখিত চারটি হকের পারস্পরিক গুরুত্বটা বিবেচনা করা যাক। সহজেই বুঝা যায় ঐ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে অর্থ বুঝা বা জ্ঞান অর্জন করা। কারণ ভুল করে পড়লে অর্থ পাল্টে যায় বলেই শুদ্ধ করে পড়তে হয়। আর অর্থ না বুঝলে কোন গ্রন্থ তিলাওয়াত করে সে অনুযায়ী আমল করা বা তার দাওয়াত দেয়া কখনই সম্ভব নয়।

এখন চলুন দেখা যাক, আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনধারী মুসলমানরা এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির বক্তব্যকে কীভাবে বা কতটুকু মানে বা অনুসরণ করে। আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা উল্লেখিত চারটি হকের একটিও ইচ্ছা করে আদায় না করে কুরআন তিলাওয়াত করে বা করবে, তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি অর্থাৎ কুফরীর গুনাহে গুনাহগার। আর এ ব্যাপারে মুসলমানদের বিশ্বাস হচ্ছে-

ক. ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন ভুল পড়লে গুনাহ হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত।

খ. ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআন অনুযায়ী আমল না করলে গুনাহ হয়। এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই।

গ. ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনের জ্ঞান অন্যকে না পৌঁছালে গুনাহ হয়। এ ব্যাপারেও সকলে একমত।

ঘ. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ নয় বরং সওয়াব হয়। এ বিষয়টি বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান বিশ্বাস করেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করেন।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআন তিলাওয়াতের সময় হক ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় না করলে, গুনাহ্ হবে না সওয়াব হবে, এ বিষয়ে

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হকের ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া রায়কে সকল মুসলমান মেনে নিয়েছেন কিন্তু সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হকটির ব্যাপারে, অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহর রায়ের বিপরীতটা মেনে নিয়েছে এবং সে অনুযায়ী আমলও করছেন। কী অবাক কান্ড, তাই না?

তথ্য-৪

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً.

অর্থঃ কুরআন 'রতল' কর নিয়ম-কানুন মেনে, স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে।
(মুয্যামমিল/৭৩:৪)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতটি বহুলপ্রচারিত। যারা কুরআন-হাদীস কিছু জানেন তাদের কুরআন পড়ার পদ্ধতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রায় সবাই এ আয়াতটিই উল্লেখ করবেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ আয়াতখানিরও رَتِّلِ শব্দের অর্থ না বুঝে পড়া বলে বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং তার উপর ব্যাপকভাবে আমলও হচ্ছে। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি رَتِّلِ শব্দের আরবী আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অর্থসহ বুঝে পড়া। তাই رَتِّلِ শব্দের সঠিক অর্থ ধরে এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে- কুরআন পড়তে হবে সঠিক (তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী) উচ্চারণ করে, অর্থ বুঝে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে। কারণ পড়ার নিয়ম-কানুনের মধ্যে এ তিনটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত।
তাহলে এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা অর্থাৎ বড় গুনাহের কাজ।

তথ্য-৫

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ.

অর্থঃ (হে মুহাম্মদ,) এই যে কিতাব (কুরআন) আমি তোমার উপর নাজিল করেছি, তা একটি বরকতময় কিতাব। (এটা নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে) যেন মানুষেরা এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। (ছোয়াদ/৩৮: ২৯)
ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এই আয়াতে মানুষকে আল-কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যই তা নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো

বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আর তা না বুঝে পড়া, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাজ। তাই যারা অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ছেন তারা এ আয়াতের বক্তব্যেরও বিপরীত কাজ করছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতধর্মী কাজ করা সওয়াব না গুনাহ এটি বোঝা কি কঠিন?

তথ্য-৬

يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ط وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অর্থঃ তারা তোমাকে মদ ও জুয়ার ব্যাপারে (আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে। তাদের বলে দাও, এই দুটো জিনিসে রয়েছে কিছু উপকার ও অনেক ক্ষতি এবং এদের ক্ষতির দিকটা উপকারের দিক থেকে অনেক অনেক বেশি। (নেক কাজে) কী কী খরচ করবে এ ব্যাপারেও তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত যা থাকবে তাই খরচ করবে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দেশসমূহ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলে দেন, যাতে তা নিয়ে তোমরা চিন্তা-গবেষণা কর বা করতে পার। (বাকারা/২: ২১৯)

ব্যাখ্যাঃ লক্ষ্য করুন, আয়াতটির প্রথম দিকে আল্লাহ্ মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু মূল তথ্য উল্লেখ করার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, ঐ দুটোয় সামান্য কিছু উপকার আছে এবং অনেক অনেক ক্ষতি বা অপকার আছে। এরপর আয়াতটির শেষাংশে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের নীতি এবং ঐ বিষয়ে মানুষের কী কর্তব্য হবে, তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে তিনি পরিষ্কারভাবে কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে চিরসত্য মৌলিক তথ্যগুলো জানিয়ে দেন। এরপর মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, ঐ তথ্যকে মূল ধরে চিন্তা-গবেষণা করে ঐ বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য বের করে নেয়া।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ মদ ও জুয়ার দোষ-গুণ সম্বন্ধে চিরসত্য মূল তথ্যটা (Basic information) মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মদ ও জুয়ার মধ্যে সামান্য কিছু উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু তার চাইতে অনেক অনেক বেশি রয়েছে অপকারিতা। এখন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মদ ও জুয়ার দোষ-গুণের ব্যাপারে ঐ তথ্যটাকে মূল ধরে আরো চিন্তা-গবেষণা করা অর্থাৎ ঐ দুটো জিনিসের দোষ-গুণ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানা এবং তা মানুষকে জানানো। যাতে মানুষেরা ঐ দুটো জিনিসের মহাক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং তার গুণটুকু শরীয়ত মত ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। মদ ও জুয়ার বেশ কিছু অপকারিতা আমরা এখন জানি। তবে এই আয়াতের তথ্য থেকে আমার মনে হয়, মদ ও জুয়া সম্বন্ধে আরো চিন্তা-গবেষণা হওয়া দরকার। আর তা হলে ঐ দুটো জিনিসের আরো অনেক ক্ষতিকর দিক মানুষ জানতে পারবে এবং তা থেকে ভবিষ্যত প্রজন্ম বাঁচতে পারবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কতো স্পষ্ট করে আল্লাহ্ এখানে কুরআনের আয়াত নিয়ে কী করতে হবে এবং কেন করতে হবে, তা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। কারণ তাতে মানুষের কল্যাণ হবে।

না বুঝে পড়া হচ্ছে চিন্তা-গবেষণার সম্পূর্ণ উল্টো কাজ। এই আয়াতের দৃষ্টিতেও তাই কুরআনকে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়া হল কুরআন পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের ১০০% উল্টো কাজ। অর্থাৎ তা বড় গুনাহের কাজ।

তথ্য-৭

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ ط

অর্থঃ তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?

(নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ এখানে কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্যে তিরস্কার করেছেন। কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা যদি আল্লাহর তিরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত কাজ হয় তবে চিন্তা-গবেষণার উল্টো কাজ অর্থাৎ উচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে পড়া, অবশ্যই আল্লাহর আরো কঠিন তিরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত কাজ হবে। আল্লাহর কঠিন তিরস্কার পাওয়ার

যোগ্য কাজ সওয়াবের কাজ, না বড় গুনাহের কাজ? প্রিয় পাঠক, আপনারাই বলুন।

তথ্য-৮

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ ط أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমান হতে পারে? তোমরা কি (কুরআনের বক্তব্য নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা কর না? (আনআম/৬ : ৫০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতটিতেও মহান আল্লাহ্ কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। অর্থাৎ এই আয়াতটির দৃষ্টিকোণ থেকেও অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লে আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে অর্থাৎ বড় গুনাহ্গার হতে হবে।

তথ্য-৯

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا.

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে? (মুহাম্মাদ/৪৭: ২৪)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ্ অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে বলার মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য আরো কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। তাহলে এ আয়াতটির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়া আল্লাহর নিকট আরো কঠোরভাবে তিরস্কৃত হওয়ার যোগ্য একটি কাজ। আল্লাহর নিকট কঠোরভাবে তিরস্কৃত হওয়ার যোগ্য কোন কাজ কখনও সওয়াবের কাজ হতে পারে না। তা অতি বড় গুনাহের কাজ হবে।

তথ্য-১০

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ

فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ ل

অর্থ: তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে আছে মুহকামাত আয়াত। ঐগুলোই কুরআনের 'মা'। বাকিগুলো হচ্ছে 'মুতাশাবিহাত' আয়াত। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'মুতাশাবিহাত' আয়াতের পেছনে লেগে থাকে এবং তার প্রকৃত অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। (আলে ইমরান/৩: ৭)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাসূলকে (স.) উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রথমে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, এই কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁর নিকট থেকে।

এরপর তিনি বলেছেন, আল-কুরআনে আছে দু'ধরনের আয়াত- 'মুহকামাত' ও 'মুতাশাবিহাত'। এর মধ্যে মুহকামাত আয়াতগুলো হচ্ছে কুরআনের 'মা' অর্থাৎ আসল আয়াত। আল-কুরআনে মূল মুহকামাত আয়াত আছে প্রায় পাঁচ শত। মূল মুহকামাত আয়াতের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য বা তার বক্তব্য বুঝানোর জন্য বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা বা উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এই আয়াতগুলোকে বলা হয়, কেচ্ছা অর্থাৎ কাহিনীর আয়াত এবং আমছাল অর্থাৎ উদাহরণের আয়াত। এ আয়াতগুলো হল মুহাকামাত আয়াতের সাহায্যকারী আয়াত। আল-কুরআনে এ ধরনের আয়াতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মুহকামাত আয়াতগুলোর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট আরবী শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূল মুহকামাত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের আকিদা (বিশ্বাস), উপাসনা, ফারায়েজ, চরিত্রগত বিষয় এবং আদেশ-নিষেধসমূহ।

শেষে আল্লাহ্ বলেছেন, যাদের মনে কুটিলতা বা শয়তানি আছে তারাই শুধু বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে 'মুতাশাবিহাত' আয়াতের পেছনে লেগে থাকে এবং তার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য বের করার চেষ্টা করে। কারণ 'মুতাশাবিহাত' আয়াতের প্রকৃত অর্থ তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া আর কেউই জানে না।

'মুতাশাবিহাত' আয়াতগুলোকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ঐ সকল আয়াত যার বক্তব্য বিষয়টি মানুষ কখনও দেখেনি, স্পর্শ করেনি বা আস্বাদ করেনি (অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়সমূহ)। যেমন আল্লাহর আরশ, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি। এগুলোর প্রকৃত অর্থ বা অবস্থা মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়।

২. কিছু কিছু সূরার শুরুতে কয়েকটি অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সে শব্দগুলো। যথা- الم، المص، يس ইত্যাদি। এগুলোর কোন অর্থ হয় না।

উপরের তথ্যগুলো জানার পর এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, 'মুতাশাবিহাত' আয়াত সম্বন্ধে আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ বক্তব্য হচ্ছে-

১. এর প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য শুধু আল্লাহই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়।

২. যে সকল মুতাশাবিহাত আয়াতের অর্থ হয়, সেগুলোতে আল্লাহ্ যে তথ্যটা, যেভাবে এবং যতটুকু বলেছেন, সে তথ্য সেভাবে এবং ততটুকু জেনে এবং বিশ্বাস করে নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হবে।

৩. 'মুতাশাবিহাত' আয়াতের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য বের করার জন্য তার পিছনে লেগে থাকা অর্থাৎ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা একটি কুটিল, শয়তানি বা ফেতনা সৃষ্টির কাজ অর্থাৎ গুনাহের কাজ।

আল্লাহ্ এই আয়াতে বলেছেন, আল-কুরআনে 'মুহকামাত' ও মুতাশাবিহাত' নামের দুই ধরনের আয়াত আছে। তাই এ আয়াতের তথ্য থেকে মুহকামাত আয়াত সম্বন্ধে যে পরোক্ষ তথ্যগুলো বের হয়ে আসে তা হচ্ছে-

১. মুহকামাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তো জানেনই। মানুষের পক্ষে তা বুঝা বা বের করাও সম্ভব।

২. মুহকামাত আয়াতে আল্লাহ্ যে তথ্যটা যেভাবে এবং যতটুকু বলেছেন, সব সময় সে তথ্য ঐভাবে এবং অতটুকু জেনে নিয়েই ক্ষান্ত দিলে চলবে না। দরকার হলে ঐ তথ্যটার পেছনে লেগে থেকে অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা করে তার প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য বের

করার চেষ্টা করতে হবে। এ কথাটিই আল্লাহ্ সরাসরি বলেছেন সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে ও সূরা ছোয়াদের ২৯ নং আয়াতে এবং তা না করার জন্যে তিরস্কার করেছেন সূরা মুহাম্মাদের ২৪ ও সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুহকামাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ, ব্যাখ্যা বা তাফসীর জানা বা বের করার চেষ্টা না করা একটা কুটিল বা শয়তানি কাজ অর্থাৎ গুনাহের কাজ।

৪. ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাকামাত আয়াতের সাধারণ অর্থও না বুঝে পড়া আরো বড় গুনাহের কাজ।

তথ্য-১১

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ط

অর্থ: যে সকল ব্যক্তিকে তাওরাত বহন করতে দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তা (প্রকৃতভাবে) বহন করে নাই, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই গাধার ন্যায় যে কিতাব বহন করে। (জুম'আ/৬২ : ৫)

ব্যাখ্যা: তাওরাত হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। তাই আল্লাহ্ এখানে তাওরাতের উদাহরণ দিয়ে ঐ সকল মানুষের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন যাদেরকে আল্লাহর কিতাব বহন করতে দেয়া হয়েছিল বা হয়েছে কিন্তু তারা সে বহনের মর্যাদা রাখেনি বা রাখছে না। আল্লাহ বলছেন, ঐ সকল মানুষের উদাহরণ হচ্ছে সেই গাধা, যে পিঠে কিতাব বহন করে চলেছিল বা চলেছে। গাধা পিঠে কিতাব বহন করে কিন্তু জানে না, ঐ কিতাবে কী কথা লেখা আছে। কোন কিতাব বা কিতাবের অংশ মুখস্থ থাকার অর্থ হচ্ছে ঐ কিতাব বা তার অংশ বহন করে নিয়ে বেড়ান। তাহলে মহান আল্লাহ এখানে, যারা আল্লাহর কিতাব মুখস্থ রাখে কিন্তু তার বক্তব্য তথা অর্থ জানে না, তাদের গাধা বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ যে কাজকে গাধার কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন সে কাজ কি সওয়াবের কাজ? না গুনাহের কাজ? অবশ্যই তা গুনাহের কাজ।

তাহলে পাঠকই বলুন, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া বা মুখস্থ রাখা কিন্তু তার অর্থ না জানা, সওয়াব না গুনাহ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সবাই বলবেন, অবশ্যই গুনাহ।

তথ্য-১২

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.

অর্থ: মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার কোনটিই আমি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, তৈরি বা রচনা করি নাই। উহা সেই লোকদের ধারণা, যারা কুফরী করে। আর ঐ ধরনের কাফের লোকদের দোযখের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। (ছোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ বলছেন, মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যকার কোন কিছুই তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, তৈরি বা রচনা করেননি। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন তিনি মহাকাশ, পৃথিবী, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, নামাজ, রোজা, আল-কুরআন ইত্যাদি কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যসহ তৈরি বা রচনা করেছেন। এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়, কথাটা বলার পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষেরা যখন তাদের জীবন পরিচালনা এবং কোনো জিনিস ব্যবহার বা কোন আমল করবে তখন তারা যেন খেয়াল রাখে, ঐ জিনিস সৃষ্টি, তৈরি বা রচনা করার পেছনে আল্লাহর কাঙ্খিত উদ্দেশ্যটা সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা।

এরপর আল্লাহ্ বলেছেন, কোন কিছু তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি, তৈরি বা রচনা করেছেন-এটি কাফের লোকদের ধারণা এবং যারা ঐ রকম ধারণা করবে, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। অর্থাৎ ঐ রকম ধারণা করা কুফরীর ন্যায় অতি বড় গুনাহের কাজ হবে।

কোন কিছু আল্লাহ্ বিনা উদ্দেশ্যে তৈরি বা রচনা করেছেন, এটা কেউ ধারণা করে কিনা তা দু'ভাবে বুঝা যায়। যথা-

ক. সে সত্যসত্যই বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ উদ্দেশ্য ছাড়াই জিনিসটি তৈরি বা রচনা করেছেন।

খ. সে ইচ্ছাকরে বা খুশী মনে কোনকিছু এমনভাবে ব্যবহার বা আমল করে যে ঐ জিনিসটা তৈরি বা রচনা করার পেছনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য ছিল, তা কখনই সাধিত হবে না।

তাহলে এখান থেকে বুঝা যায়, যদি ইচ্ছা করে কোন জিনিসের ব্যবহার বা কোন আমল এমনভাবে করা হয় যাতে ঐ জিনিস তৈরি বা ঐ আমল রচনা করার পেছনে আল্লাহর যে উদ্দেশ্য, তা কখনই সাধিত হবে না, তবে তা কুফরীর গুনাহের ন্যায় একটা অতি বড় গুনাহের কাজ হবে।

মহান আল্লাহর আল-কুরআন রচনা করার উদ্দেশ্য হল, মানুষ তা পড়ে জ্ঞানার্জন করবে এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী তার পুরো জীবনটা পরিচালনা করবে। যে পড়ায় জ্ঞানার্জন হয় না, সে পড়া দ্বারা আল্লাহর কুরআন রচনার উদ্দেশ্য কখনই সাধিত হতে পারে না। তাই এই আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইচ্ছাকৃতভাবে সেভাবে, অর্থাৎ অর্থ ছাড়া বা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কুরআন পড়া অতি বড় গুনাহের কাজ হবে।

তথ্য-১৩

কুরআনের কয়েকটি জায়গায় কুরআন পড়া নিয়ে রাসূলকে (স.) প্রায় একই রকম কথা বলা হয়েছে। যেহেতু বক্তব্যটা প্রায় একই রকম, তাই দুটি সূরার বক্তব্য পর পর উল্লেখ এবং ব্যাখ্যাটা এক সাথে আলোচনা করা হল।

সূরা কিয়ামাহ-এর ১৬ থেকে ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন-

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

অর্থঃ (হে নবী, কুরআনের আয়াতকে) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে আপনার জিহ্বাকে বারবার নাড়াবেন না। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন পড়তে থাকা হয়, তখন আপনি তার পাঠকে মনোযোগসহকারে শুনতে থাকবেন। পরে তার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্বে রয়েছে।

সূরা তোয়াহার ১১৪নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন-

وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

অর্থঃ আর (হে নবী,) কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না আপনার নিকট এর ওহী পূর্ণতায় পৌঁছে যায় এবং দোয়া করতে থাকবেন, হে রব, আমার জ্ঞানকে আরো বাড়িয়ে দিন।

ব্যাখ্যাঃ আয়াত দুটোর কথাগুলো বলা হয়েছে রাসূল (স.) কে উদ্দেশ্য করে। তাহলে কি সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর থেকে শিক্ষা নেই? অবশ্যই আছে। কারণ তা না থাকলে পবিত্র কুরআনের কয়েক জায়গায় ঐ ধরনের বক্তব্য, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পড়া ও লিখার ব্যবস্থা রেখে আল্লাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অপরিসীম সময় ও সম্পদ নষ্ট করতেন না। আয়াত দুটোয় রাসূল (স.) কে কী বলা হয়েছে এবং তা থেকে সাধারণ মুসলমানদের কী শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছে, তা বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো আগে বুঝতে বা জানতে হবে-

- ❑ 'ওহী' বলতে বুঝায় কুরআনের আয়াত, সাধারণ শিক্ষা বা গোপন ইঙ্গিত।
- ❑ আয়াত দুটো নাযিল হয়েছে ওহী নাযিল শুরু হওয়ার প্রথম দিকে যখন রাসূল (স.) ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে উঠতে পারেননি।
- ❑ ভুলে যাওয়ার ভয়ে প্রথম দিকে রাসূল (স.) এর স্বাভাবিক চেষ্টা ছিল জিব্রীল (আ.) এর মুখ থেকে একটা আয়াত বের হওয়ার সাথে সাথে বারবার পড়ে তা মুখস্থ করে নেয়া।
- ❑ রাসূল (স.) এর মাতৃভাষা আরবী হওয়াতে নাযিল হওয়া অধিকাংশ আয়াতের অর্থ তিনি বুঝতে পারতেন কিন্তু যে সকল শব্দ আগে কখনও শুনেননি, সেগুলো জিব্রীল (আ.) এর মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য তিনি স্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

উপরের তথ্যগুলো সামনে রাখলে এটা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, আয়াত দুটোতে জিব্রীল (আ.), রাসূল (স.)কে নিম্নের কথাগুলো বলেছেন। জিব্রীল (আ.) বলেছেন, হে রাসূল (স.), আপনার নিকট কুরআন পৌঁছানোর ব্যাপারে আমাকে তিনটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যথা-

১. সঠিক পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআনকে পড়িয়ে দেয়া,
২. কুরআনকে মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং
৩. কুরআনকে প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া।

তাই কুরআনের কোন আয়াত যখন আমি আপনাকে প্রথম শুনাতে থাকি, তখন আপনি সেটা মুখস্থ করার জন্য বা তার ব্যাখ্যা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। আপনি নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভাষা আরবী হওয়ার করণে, আয়াতের যতটুকু আপনার বুঝে আসে, তাতেই সন্তুষ্ট থেকে প্রথমে খেয়াল করবেন কিভাবে আমি পড়ছি (অর্থাৎ কুরআনের পঠন পদ্ধতির দিকে)। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে না পড়তে পারলে একটি আয়াতের সঠিক অর্থ ও ভাব মনে আসবে না। পরে আমি ঐ আয়াত আপনাকে মুখস্থ করিয়ে এবং প্রয়োজন মতো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। তারপরেও আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন আপনার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য।

এবার চলুন, সাধারণ মুসলমানদের এই আয়াত দুটো থেকে কী শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়েছে, তা দেখা যাক। সাধারণ মুসলমানদের কুরআন মুখস্থ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্ নেননি। তাই কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, এ কথা তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। আবার সাধারণ মুসলমানদের কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আল্লাহ্ নেননি। তাছাড়া যাদের মাতৃভাষা আরবী নয়, তারা তো রাসূল (স.) এর মত একটি আয়াত পড়লে তার সাধারণ বা মোটামুটি অর্থও বুঝতে পারবে না। ব্যাখ্যাতো দূরের কথা। তাই সাধারণ মুসলমানদের জন্য কুরআন পড়ার সময় তার অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ো না-এ কথাটাও প্রযোজ্য হবে না।

সাধারণ মুসলমানদের এই আয়াত দুটোর মাধ্যমে আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা কুরআন পড়ার সময় না বুঝে সওয়াব কামাইয়ের লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি খতম দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। একটি আয়াত পড়ার সময় প্রথমে সঠিক পঠন পদ্ধতি অনুযায়ী তা পড়বে। তারপর তার অর্থ ও প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা জেনে নেবে, তারপর দ্বিতীয় আয়াতে যাবে। এরপরেও তোমাদের জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আমার নিকট দোয়া করবে। এই আয়াতগুলোর এরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনকারী হাদীস পরে আসছে। তাহলে এ আয়াত অনুযায়ীও অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা অর্থাৎ গুনাহের কাজ।

সুধী পাঠক, না বুঝে কুরআন খতম দেয়ার আগ্রহ মুসলমানদের মধ্যে আজ ব্যাপক। তাদের অধিকাংশের কাছে আজ কুরআনের অর্থ জানার চেয়ে, না বুঝে পড়া বা খতম দেয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তারাবিহ নামাজে তাড়াতাড়ি খতম দেয়ার জন্য হাফেজ সাহেব কী পড়েন একজন ভাল আরবী জানা লোকও তা বুঝতে পারবেন না। সওয়াবের আশায় কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্টো কাজ করার কী দারুণ প্রবণতা, তাই না?

তথ্য-১৪

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ ... ...

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তোমরা ততক্ষণ নামাজের ধারে-কাছে যাবে না, যতক্ষণ না বুঝতে পার, তোমারা কী বলছ ... ...
(নিসা/৪: ৪৩)

ব্যাখ্যাঃ পর্যায়ক্রমে মদ হারাম হওয়ার দ্বিতীয় হুকুমটা আল্লাহ্ এই আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়েছেন। আল্লাহ্ এখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একজন ঈমানদার কখন নামাজে দাঁড়াতে পারবে, তার মাপকাঠিটা বলে দিয়েছেন। সে মাপকাঠিটা হচ্ছে, নামাজে দাঁড়িয়ে কী পড়া বা বলা হচ্ছে তা বুঝতে পারা। কথাটা নেশাগ্রস্তদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তবে একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের জন্য যদি তা প্রযোজ্য হয়, তবে একজন প্রকৃতিস্থ মানুষের জন্য তা আরো বেশি করে প্রযোজ্য হওয়ারই কথা। একজন নামাজী নামাজে দাঁড়িয়ে যা বলছেন বা পড়ছেন, তা বুঝতে না পারার তিনটি অর্থ হতে পারে। যথা-

ক. কবিতা পড়ছে না কুরআন পড়ছে, তা বুঝতে না পারা,
খ. শুদ্ধ পড়ছে না অশুদ্ধ পড়ছে, তা বুঝতে না পারা, এবং
গ. যা পড়ছে তার অর্থ বুঝতে না পারা।

প্রথম দুটো অবস্থায় সুস্থ-অসুস্থ সকলেরই নামাজে দাঁড়ানো নিষেধ, এটা নিয়ে বর্তমান মুসলমান জাতির মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু ৩নং অবস্থায় সুস্থ মানুষের নামাজে দাঁড়ানো নিষেধ নেই, এটা তারা (প্রায়) সবাই মনে করেন। এটা যে তারা মনে করেন, তাদের বাস্তব

আমলই তার প্রমাণ। কারণ অধিকাংশ মুসলমান নামাজে কী পড়ছেন, তা বুঝেন না। কিন্তু কুরআন বুঝে পড়ার ব্যাপারে পূর্ব উল্লেখিত সকল আয়াতের তথ্যগুলো জানার পর মনে হয়, ৩নং অবস্থাটাও অর্থাৎ নামাজে যা পড়া হচ্ছে তার অর্থ বুঝতে পারার বিষয়টাও সুস্থ মানুষের নামাজে দাঁড়ানোর নিয়ম-কানুনের (আরকান-আহকাম) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অর্থ না বুঝলে নামাজে কালাম, তাসবীহ ও দোয়া পড়ানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যগুলোই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

ক. কালাম অর্থাৎ কুরআন পড়ানোর মাধ্যমে শয়তানের ১নং কাজকে ব্যর্থ করে দেয়া। শয়তানের ১নং কাজ হচ্ছে, মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। নামাজে বারবার কালাম পড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছেন মুসলমানরা কুরআনের জ্ঞানকে অর্থাৎ ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক, অনেক দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক এবং কিছু অমৌলিক বিষয় যেন কোনভাবে ভুলে না যায় বা ভুলে যেতে না পারে। বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি' পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' নামক বইটিতে।

খ. তাসবীহ ও কালাম পড়ানোর মাধ্যমে, তাঁর (আল্লাহর) সামনে দাঁড় করিয়ে নামাজীর মুখ দিয়ে কিছু কথা স্বীকার বা অঙ্গীকার করিয়ে নেয়া। যেন নামাজী সে স্বীকার বা অঙ্গীকার অনুযায়ী নামাজের বাইরেও চলে।

নামাজে যা পড়া হচ্ছে, তা না বুঝার আগে নামাজে দাঁড়ানো নিষেধ হওয়া শর্তটার প্রয়োগ এরকম হবে না যে, পুরো অর্থ না বুঝার আগ পর্যন্ত নামাজে দাঁড়ানো যাবে না। বরং তা হবে এরকম যে, এ তথ্যটা জানার পর থেকেই নামাজে যা কিছু পড়া হচ্ছে, তার অর্থ জানা ও বুঝার চেষ্টা শুরু করে দেয়া এবং সাথে সাথে নামাজ পড়াও চালু রাখা।

সুধী পাঠক, আশা করি, আপনারা সবাই একমত হবেন, উপরে উল্লেখিত ১৪টি তথ্যের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহান আল্লাহ আল-কুরআনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনকে অর্থসহ

বুঝে বুঝে পড়তে হবে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া বা খতম দেয়া একটা বড় গুনাহের কাজ। আর কুরআন ঐ ধরনের কাজকে কুফরী কাজ বলেও উল্লেখ করেছে।

'অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি' কথাটি আল-কুরআনে থাকা সম্ভব কিনা

উপরে আল-কুরআন থেকে যে ১৪টি তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায়, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া কুরআন পড়ার অর্থ হচ্ছে, কুরআন পড়ার ব্যাপারে আল্লাহর প্রত্যক্ষ (Direct) এবং পরোক্ষ (Indirect) নির্দেশের বিপরীত কাজ করা বা অমান্য করা। প্রশ্ন আসতে পারে, ঐ ১৪টি তথ্যের বাইরেও কুরআনে আর কোন তথ্য আছে কিনা, যা থেকে বুঝা যায় অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও সওয়াব হবে। তাই চলুন এখন আলোচনা করা যাক, কুরআন অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লেও সওয়াব হবে- এমন কথা আল-কুরআনে থাকা সম্ভব কিনা-

তথ্য-১

● পরস্পর বিরোধী কথার দৃষ্টিকোণ

'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি' কথাটা অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়াকে শুধু অনুমতিই দেয় না বরং তা ভীষণভাবে উৎসাহিতও করে। তাই কথাটা পূর্বোল্লেখিত কুরআনের তথ্যগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ-

- ❑ কুরআন বলছে, বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝে বুঝে কুরআনকে পড়তে হবে। আর 'কথাটা' বলছে না বুঝেও কুরআন পড়া যাবে।
- ❑ কুরআন বলছে, কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে। আর 'কথাটা' বলছে, চিন্তা-গবেষণা তো দূরের কথা, না বুঝে কুরআন পড়লেও সওয়াব।
- ❑ কুরআন তার বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠিন ভাষায় তিরস্কার করেছে, আর 'কথাটা' না বুঝে কুরআন পড়াকে উৎসাহিত করেছে।

- কুরআন বলছে, যেভাবে কুরআন পড়লে কুরআন পড়ার হক আদায় হয় না (যেমন না বুঝে পড়া), ইচ্ছাকৃতভাবে সেভাবে যারা কুরআন পড়বে, তারা কুফরীর গুনাহে গুনাহগার। আর 'কথাটা' বলছে, না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াবের কাজ।
- কুরআন বলছে, যেভাবে কুরআন পড়লে কুরআন নাযিলের বা কুরআন পড়ার উদ্দেশ্য (অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী আমল করা) সাধিত হয় না, ইচ্ছাকৃতভাবে সেভাবে (যেমন না বুঝে) কুরআন পড়া কুফরী কাজ এবং যারা তা করবে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর 'কথাটা' বলছে, না বুঝে কুরআন পড়া দশ গুণ সওয়াবের কাজ।

সাধারণ বিবেক বলে কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকার কথা নয়। কারণ, তা থাকলে মানুষ কোনটার ওপর আমল করবে, সে ব্যাপারে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে যাবে। আর এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নিকট থেকে আসত, তবে এতে বহু পরস্পরবিরোধী কথা থাকত।

(নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, আল-কুরআন তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্তার নিকট থেকে আসলে এতে অসংখ্য পরস্পর বিরোধী কথা থাকত। অর্থাৎ আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন, যেহেতু আল-কুরআন তাঁর নিকট থেকে আসা কিতাব, তাই এতে পরস্পর বিরোধী কোন কথা বা বক্তব্য নেই। আল-কুরআন, কুরআনকে বুঝে পড়তে বা তার বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছে অথবা তার বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্যে তিরস্কার করেছে অথবা ইচ্ছা করে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়াকে বড় গুনাহের কাজ বলেছে। তাই ঐ ধরনের বক্তব্যের উল্টো বক্তব্য তথা অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ার অনুমতি বা অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি, আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবন বিধানে থাকতে পারে না বা থাকা অসম্ভব।

তথ্য-২

● শয়তানের ১নং কাজকে দারুণভাবে সহায়তার দৃষ্টিকোণ

ইবলিস শয়তানের ১নং কাজ হচ্ছে 'মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা'। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১নং কাজ কোন্‌টি এবং শয়তানের ১নং কাজ কোন্‌টি' নামক বইটিতে।

'অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি' কথাটার প্রভাবে অসংখ্য মুসলমান নেকির আশায় অর্থ ছাড়া কুরআন পড়ছে বা তাড়াতাড়ি কুরআন খতম দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তারা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। অর্থাৎ তারা কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। কথাটা অত্যন্ত কৌশলে, কুরআনপ্রিয় অসংখ্য মানুষকে কুরআন পাঠের প্রধানতম উদ্দেশ্য ও হকের (কুরআনের জ্ঞান অর্জন) থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। অতএব এটা অতি সহজে বুঝা যায়, কথাটা শয়তানের ১নং কাজকে দারুণভাবে সাহায্য করছে। এমন একটি কথা তাই কুরআনে তথা ইসলামী জীবন বিধানে থাকা সম্ভব নয়।

তথ্য-৩

● চিরন্তনভাবে বিবেক-বিরুদ্ধ মুহকামাত আয়াতের দৃষ্টিকোণ

বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধীয় যত বক্তব্য কুরআনে আছে, তা একত্র করলে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হচ্ছে- আল-কুরআনের মুহকামাত আয়াতে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বক্তব্য সম্বলিত আয়াতে) এমন কোন বক্তব্য নেই, যা চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে থাকবে অর্থাৎ মানুষ কখনই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারবে না। চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে থাকবে শুধু মুতাশাবিহাত আয়াতের বক্তব্যসমূহ। অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহ। বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কোন গ্রন্থ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লে কল্যাণ বা সওয়াব হয়, এটা চরম বিবেক-বিরুদ্ধ মুহকামাত কথা। তাই এমন কথা কুরআনে থাকার কথা নয়।

আল-হাদীস অনুযায়ী অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ

চলুন এখন, আলোচ্য বিষয়ে হাদীসে কী বক্তব্য আছে তা দেখা যাক। হাদীসের তথ্য পর্যালোচনার আগে হাদীস সম্বন্ধে কিছু তথ্য জেনে নেয়া দরকার।

রাসূল (স.)এঁর প্রধান কাজ ছিল, কুরআনের বক্তব্যকে কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া। আর সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, কুরআনের একটি কথাও যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে না মানে বা না করে, তবে দুনিয়ায় তার হবে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে হবে কঠিন শাস্তি। তাই-

ক. কুরআন পড়ার ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত তথ্যগুলো রাসূল (স.) বলেননি বা ব্যাখ্যা করেননি বা সে অনুযায়ী আমল করেননি, তা হতে পারে না। অর্থাৎ হাদীস গ্রন্থে উপরের বক্তব্য সমর্থনকারী বা ব্যাখ্যাকারী হাদীস অবশ্যই থাকবে বা আছে।

খ. কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের উল্টো কোন কথা বা কাজ রাসূল (স.) কখনই বলতে বা করতে পারেন না। অর্থাৎ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের উল্টো কোন কথা রাসূল (স.) এর বক্তব্য হতে পারে না। তাই রাসূল (স.) নিজেই বলেছেন, 'তোমাদের নিকট আমার নামে কোন কথা বলা হলে তা কুরআনের সঙ্গে মিলাবে। যদি তা কুরআনের কোন বক্তব্যের উল্টো হয়, তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে'। তাই কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের উল্টো কোন কথা হাদীসের কথা হতে পারে না। সে কথা হবে-

- ❑ হাদীসের নামে মিথ্যা বা বানানো কথা বা
- ❑ কোন হাদীসের অসতর্ক ব্যাখ্যা।

সুতরাং অর্থসহ বা অর্থ ছাড়া কুরআন পড়ার ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের উল্টো কোন বক্তব্য হাদীসের বক্তব্য হতে পারে না। সেটা হবে, হাদীসের নামে মিথ্যা কথা অথবা কোন হাদীসের অসতর্ক ব্যাখ্যা।

হাদীস সম্বন্ধে উপরের তথ্যগুলো বুঝে নেয়ার পর চলুন এখন, হাদীসের তথ্যগুলো সরাসরি জানা যাক-

তথ্য-১

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ(ص) إِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَ اَصْوَاتِهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ لُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَ سَيَجِيْءُ بَعْدَ قَوْمٍ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَ هُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ. (بيهاقى،رجين)

অর্থঃ হযরত হুজাইফা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের স্বরে ও সুরে এবং দূরে থাক আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত এবং তাদের অন্তরও, যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

(বায়হাকী, রজীন,মিশকাত:২১০৩)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (স.) এখানে প্রথমে বলেছেন, কুরআনকে আরবদের পড়ার স্বাভাবিক স্বর ও সুরে পড়তে। এরপর তিনি নিষেধ করেছেন, কুরআনকে আহলে এশক (যারা সুরের মাধ্যমে মানুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চায়) এবং আহলে কিতাবদের স্বরে পড়তে।

তারপর রাসূল (স.) বলেছেন, তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর শীঘ্রই এমন লোকদের উদয় হবে যারা কুরআনকে বিলাপের ও গানের সুরে পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ তারা কুরআনের অর্থ, মর্ম বা ভাব কিছুই জানবে না বা বুঝবে না অথবা জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করবে না।

তারপর রাসূল (স.) বলেছেন, যারা উপরের পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে, তারা উভয়েই দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত। দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্তরা অবশ্যই গুনাহগার। তাই রাসূল (স.) এ হাদীসখানির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা কুরআন

পড়বে কিন্তু তার অর্থ বুঝবে না বা বুঝার চেষ্টা করবে না, তারা গুনাহগার। অর্থাৎ (ইচ্ছাকৃতভাবে) অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহের কাজ।

তথ্য-২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন বা অন্বেষণ করা ফরজ।

(ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুলপ্রচারিত। জ্ঞান অর্জনের উপায়গুলো হচ্ছে- পড়া, শুনা এবং দেখা। এর মধ্যে পড়াটা হচ্ছে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (স.) এখানে পড়াকে ফরজ বলেননি। জ্ঞান অর্জনকে ফরজ বলেছেন। তাহলে যে পড়ায় জ্ঞান অর্জন হয় না বা যে পড়ার লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন নয়, সে পড়ায়, পড়া আমলের ফরজ রুকন আদায় হয় না। ইসলামী জীবন বিধানে কোন আমলের ফরজ তরক হয়ে গেলে সে আমল করা হয়নি ধরা হয়। যেমন নামাজের কোন ফরজ তরক হয়ে গেলে, সে নামাজ হয় না। অর্থাৎ সে নামাজ পড়া হয়নি ধরা হয়। তাই ঐভাবে নামাজ পড়লে গুনাহ হয়। এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন পড়া আমলটির ফরজ দিকটি হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। তাই যে কুরআন পড়ায় জ্ঞান অর্জন হয় না, সে কুরআন পড়ায় ফরজ তরক হয়ে যায়। সুতরাং হাদীসখানির দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐভাবে কুরআন পড়লে সওয়াব না হয়ে গুনাহ হবে।

তথ্য-৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ. (رواه الترمذى، ابوداؤد،دارمى)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন,যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝেনি।(তিরমিযি, আবু দাউদ, দারেমী,মিশকাত:২০৯৭)

ব্যাখ্যাঃ তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই বুঝে পড়া যায়। কিন্তু পুরো কুরআন ভালভাবে বুঝে তিন দিনের মধ্যে শেষ করা বা খতম দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সহজেই বুঝা যায়, হাদীসখানিতে রাসূল (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন খতম দেয় সে কুরআন বুঝে নাই। অর্থাৎ সে না বুঝে কুরআন খতম দিয়েছে। আর হাদীসখানির বক্তব্যের ধরন থেকে বুঝা যায়, এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে তিনি নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ না বুঝে কুরআন খতম দেয়াকে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন। সুতরাং তা গুনাহের কাজ। পূর্বে (৩৭ নং পৃষ্ঠা) কুরআনের ১৩ নং তথ্যের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে তার সমর্থনকারী হাদীস।

তথ্য-৪

যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে নামবে না, তারা দীন হতে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা)

ব্যাখ্যাঃ এখানে রাসূল (স.) বলেছেন, যারা অর্থছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়বে, তারা দীন হতে অর্থাৎ ইসলাম হতে তীরের বেগে বের হয়ে যাবে। কারণ, তারা জানবে না কুরআন কোন্‌টা করতে আদেশ দিয়েছে এবং কোন্‌টা করতে নিষেধ করেছে। তাই কাজ করার সময় তারা এমন কাজ করবে, যেটা কুরআন স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। ফলে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। ইসলাম থেকে তীরের মত বের হয়ে যাওয়া কি সওয়াবের কাজ? না গুনাহের কাজ? পাঠকই বলুন।

তথ্য-৫

জ্ঞান দু'প্রকারের। একপ্রকারের জ্ঞান হলো-যা মুখ অতিক্রম করে অন্তরে গিয়ে স্থান নেয়। এ জ্ঞানই কিয়ামতের দিন কাজে আসবে। আর একপ্রকার জ্ঞান আছে, যা মুখ পর্যন্তই থাকে অন্তরে পৌঁছে না। এই জ্ঞান আল্লাহর দরবারে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে দাঁড়াবে। (দারেমী)

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, অর্থসহ বা বুঝে বুঝে কুরআন পড়লে সে পড়া কিয়ামতের দিন কাজে আসবে। অন্যদিকে না বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পড়লে ঐ পড়া কিয়ামতের দিন পাঠকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

যে কাজের জন্য কুরআন বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সে কাজ অবশ্যই গুনাহের কাজ।

❑❑ উপরের ১,৪,ও ৫নং তথ্যের হাদীস তিনটিতে কুরআন তাদের 'কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না', কুরআন তাদের 'গলার নিচে নামবে না', কুরআন তাদের 'অন্তরে পৌঁছবে না'-কথাগুলো দিয়ে রাসূল (স). কী বলতে চেয়েছেন, তা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিস্ময়কর বিভ্রান্তি আছে। অনেকে বলেন যে, ঐ কথাগুলো দিয়ে রাসূল (স.) আমলের কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, কুরআন পড়বে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করবে না। তাই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা দরকার।

কোন কিছু পড়ে সে অনুযায়ী আমল বা কাজ করতে গেলে প্রথমে বিষয়টি বুঝতে হবে, এ কথাটা বুঝা কি কোন কঠিন ব্যাপার? বিষয়টা না বুঝলে আমল করা যাবে কী ভাবে? পড়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের। আর পড়ার সঙ্গে আমলের বা কাজের সম্পর্ক হচ্ছে তার পরের স্তরে। তাই আল কুরআনেও আল্লাহ্ পড়া (اِقْرَأْ) বা বই (كِتَابٌ) শব্দ দুটো উল্লেখ করার পরপরই এমন সব কথা বলেছেন, যে গুলো সরাসরি জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আমলের সঙ্গে নয়। আল-কুরআনে ঈমান শব্দটা উল্লেখ করার পরপরই ন্যায় কাজের কথা অর্থাৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। কারণ জানা (জ্ঞান) ও বিশ্বাসকে এক সঙ্গে বলা হয় ঈমান। জ্ঞান ছাড়া যেমন ঈমান হয় না, তেমন বিশ্বাস ছাড়াও ঈমান হয় না। উপরের তথ্যগুলো জানার পর আমার তো মনে হয়, কারো মনে সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, উল্লেখিত তিনটা হাদীসে রাসূল (স.) 'কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না','গলার নিচে নামবে না', 'অন্তরে পৌঁছবে না'- কথাগুলো দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, কুরআন তারা পড়বে কিন্তু তা বুঝবে না বা বুঝার চেষ্টা করবে না। চার নং তথ্যের হাদীসটাতে রাসূল (স.) বিষয়টা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু পড়ার সঙ্গে সরাসরি তথা প্রথম স্তরের সম্পর্কযুক্ত কাজটি করবে না অর্থাৎ বুঝবে না (গলার নিচে নামাবে না), তারা যখন পড়ার সঙ্গে ২য় স্তরের সম্পর্কযুক্ত কাজটি করতে যাবে অর্থাৎ তা বাস্তবায়ন বা আমল করতে যাবে, তখন তারা ইসলাম থেকে তীরের বেগে বের হয়ে যাবে। কারণ তারা তো পড়ার

সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত কাজটি অর্থাৎ তা বুঝার কাজটি করেনি। তাই আমল করার সময় তাদের আমল সঠিক হবে না।

তথ্য-৬

ক. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ সূরা তীন পড়ার সময় এ পর্যন্ত পড়ে, 'আল্লাহ্ কি আহকামুল হাকীমিন নন?' তখন সে যেন বলে, নিশ্চয়ই, আমিও এর সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি। আবার যখন সে সূরা কিয়ামাহের এ পর্যন্ত পৌঁছে, 'তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?' তখন সে যেন বলে, নিশ্চয়ই। আবার যখন সে সূরা মুরছালাত-এর এ পর্যন্ত পড়ে, 'এই কালামের (কুরআন) পরে আর কোন্ কালাম থাকতে পারে, যার প্রতি তারা ঈমান আনবে?' তখন সে যেন বলে, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযি)

খ. হযরত হুজাইফা (রা.) বলেন, তিনি নবী করিম (স.)-এর সঙ্গে নামাজ পড়েছেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোন আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখনই তিনি আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।

(তিরিমিযি, আবু দাউদ, দারেমী, নাসায়ী)

গ. হযরত হুজাইফা ইবনে ইয়ামন (রা.) বলেছেন, একবার আমি রাত্রিকালীন সালাতে রাসূল (স.) এঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন দেখলাম তিনি কুরআন পড়ছেন এভাবে- যেখানে তাসবীহ করতে বলা হয়েছে সেখানে তাসবীহ করছেন, যেখানে দোয়া করার সুযোগ আছে সেখানে দোয়া করছেন, যেখানে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপার এসেছে সেখানে তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছেন।

(মুসলিম, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা: এই তিনটা হাদীসের প্রথমটিতে রাসূল (স.) কুরআন পড়ার সময় কী করতে হবে তা মুখে বলেছেন (কাওলী হাদীস) । আর পরের দুটোতে তিনি তা বাস্তবে করে দেখিয়ে দিয়েছেন (ফেয়লী হাদীস)। হাদীস তিনটা (এ রকম আরো হাদীস আছে) থেকে অতি সহজে বুঝা যায়, রাসূল (স.)

কুরআন শুধু বুঝে বুঝে পড়তে বলেন নাই, একটি আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে বা ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বা সে ভাবের উত্তরমূলক ভাব প্রকাশ করার আগে, পরবর্তী আয়াতে না যাওয়ার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন এবং তা বাস্তবে করেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

নামাজের মধ্যে কুরআন পড়ার সময় ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে কিনা, এ ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও, নামাজের বাইরে তা করা যে রাসূল (স.) এর সুন্নাহ- এ ব্যাপারে সকল ইমামই একমত। আর অর্থ না বুঝলে এ সুন্নাহের অনুসরণ করা যে সম্ভব নয়, সেটাতো দিবালোকের মতই সত্য। একটি আমল যেভাবে করলে, ঐ আমলের ব্যাপারে রাসূল (স.) এর সুন্নাহের অনুসরণ কোনভাবেই সম্ভব নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে সেভাবে ঐ আমল করা কি সওয়াব? পাঠকের বিবেকের নিকট প্রশ্ন।

সুধী পাঠক, উপরের হাদীসগুলো থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, রাসূল (স.) কুরআন অর্থসহ বুঝে বুঝে পড়তে বলেছেন এবং তা নিজে করেও দেখিয়ে দিয়েছেন এবং যারা অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়বে, তারা দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত বা কিয়ামতে কুরআন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বা তারা ইসলাম থেকে তীরের মত বের হয়ে যাবে, এসব কথা বলেছেন। এ হাদীসগুলো কুরআন বুঝে বা না বুঝে পড়ার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্যগুলোর হয় সমর্থবোধক, না হয় ব্যাখ্যা। তাই হাদীসগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। কুরআন পড়া সম্পর্কে রাসূল (স.) এর বক্তব্য এরকম হওয়ারই কথা। কারণ তিনি তো কুরআনের বিপরীত কথা কোনক্রমেই বলতে পারেন না।

তথ্য-৭

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পড়েছে তার নেকি মিলবে আর নেকি হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে (الم) একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি, মিম্ একটি ও লাম একটি অক্ষর। (তিরমিযী ও দারেমী; তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ কিন্তু সনদের দিক থেকে গরীব বলেছেন)

ব্যাখ্যাঃ কুরআন 'অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি' কথাটির উৎপত্তি এই হাদীক। আর এই ব্যাখ্যাটি অবিশ্বাস্যরকম ব্যাপক প্রচারও পেয়েছে। যার ফলে আজ প্রায় সকল মুসলমানই এই ব্যাখ্যাটি জানে। আর এর উপর আমল করতে যেয়ে অধিকাংশ মুসলমানই আজ যা করছে, তা হচ্ছে-

১. অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ছে,

২. বেশি সওয়াব কামাই করার জন্য না বুঝে দ্রুত খতম দেয়ার চেষ্টা করছে, কারণ যত অক্ষর পড়তে পারবে তার দশগুণ সওয়াব পাবে,

৩. কুরআন পড়ছে কিন্তু তার বক্তব্য জানার ব্যাপারে রয়ে যাচ্ছে, যে কুরআন পড়ছে না তার স্তরে। ফলে শয়তান অতি সহজে ধোঁকা দিয়ে, কুরআনের যে বক্তব্যটা একটু আগেই সে পড়েছে, তার উল্টো কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে।

চলুন, এবার হাদীসটির ব্যাখ্যা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। বিশ্ব মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য তা আজ বিশেষভাবে দরকার।

রাসূল (স.) এখানে কুরআনের একটি অক্ষর বলতে আসলে বুঝিয়েছেন কুরআনের একটি শব্দ বা বাক্য (আয়াত)। কারণ কুরআনের শুধু একটি অক্ষর কেউ কখনো পড়ে না। এখন পড়া (اقْرَأ) শব্দটির অর্থ বুঝে বা না বুঝে পড়া ধরে হাদীসটির দু'রকম ব্যাখ্যা করা যায়। যথা-

১. কুরআনের একটি শব্দ বুঝে বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি,

২. কুরআনের একটি শব্দ না বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি।

পড়া (اقْرَأ) শব্দটির অর্থ 'না বুঝে পড়া'- এটা পৃথিবীর কোনও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই গ্রহণ করবে না এবং আরবী অভিধানেও নেই।

অন্যদিকে তার অর্থ 'বুঝে পড়া'- এটা পৃথিবীর সকল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এক বাক্যে গ্রহণ করবে এবং আরবী অভিধানও তাই বলে।

এখন পড়া শব্দটির অর্থ না বুঝে পড়া ধরে হাদীসটির ব্যাখ্যা করলে যে তথ্যটি (কুরআনের একটি শব্দ না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি) বের হয়ে আসে এবং যেটা বর্তমানে প্রায় সকল মুসলমান গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সে অনুযায়ী তাদের অধিকাংশ আমলও করছে, সেটি গ্রহণ করতে হলে-

১. কুরআন পড়া সম্পর্কে (পূর্বে আলোচনাকৃত) কুরআনের সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যকে অস্বীকার করতে হবে।

২. একটা দুর্বল সহীহ (গরীব) হাদীসের 'অসতর্ক ব্যাখ্যাকে' গ্রহণ করতে যেয়ে অন্যান্য শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্যকে অস্বীকার করতে হবে। (যে হাদীসের কোন এক যুগে বর্ণনাকারী মাত্র একজন, তাকে গরীব হাদীস বলে। আর যে সকল হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা সব যুগেই অনেক ছিল, তাকে শক্তিশালী হাদীস বলে। আলোচ্য হাদীসটি ইমাম মুসলিমের মতে গরীব)

৩. ১০০% বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী একটি কথাকে গ্রহণ করতে হবে।

তাই পৃথিবী উল্টে গেলেও হাদীসখানির এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

পক্ষান্তরে পড়া শব্দটির অর্থ বুঝে পড়া ধরে হাদীসটির ব্যাখ্যা করলে যে তথ্যটি (কুরআনের একটি শব্দ বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি) বের হয়ে আসে, সেটি গ্রহণ করলে-

১. কুরআনের বক্তব্যের সমর্থনকারী ব্যাখ্যা হয়।

২. অন্যান্য শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্যের সমর্থনকারী তথ্য হয়।

৩. ১০০% বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাখ্যা হয়।

তাই ইসলামী জীবন বিধানে হাদীসখানির এ ব্যাখ্যাটিই গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ কেউ বলতে চান যে, হাদীসটিতে রাসূল (স.) উদাহরণস্বরূপ যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন (الم) তার তো কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তবুও রাসূল (স.) বলেছেন, الم পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি হবে। এ থেকে বুঝা যায়, না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি হবে। এ কথার উত্তর হচ্ছে, الم একটা 'মুতাশাবিহাত' শব্দ। এর কোন অর্থ হয় না। তাই এটা অর্থ ছাড়া পড়লে সওয়াব হবে এবং এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতে

গেলে গুনাহ হবে। কিন্তু মুহকামাত আয়াতের ব্যাপারে এর উল্টো হবে। বিষয়টি কুরআনের ১৩ নং তথ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের সারসংক্ষেপ

কুরআনের তথ্যসমূহের সারসংক্ষেপ

১. সকল মুহকামাত এবং অর্থ হয় এমন মুতাশাবিহাত আয়াতকে অর্থসহ বা বুঝে পড়তে সকল মু'মিনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা বলা হয়েছে।

২. মুতাশাবিহাত আয়াতের বক্তব্যগুলোর প্রকৃত অর্থ বের করার জন্য তার পেছনে লেগে থাকাকে অর্থাৎ তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে শয়তানি বা ফেতনা সৃষ্টির কাজ অর্থাৎ গুনাহের কাজ বলা হয়েছে।

৩. মুহকামাত আয়াতের বক্তব্য নিয়ে সবাইকে সাধ্যানুযায়ী চিন্তা-গবেষণা করতে বলা হয়েছে।

৪. মুহকামাত আয়াতের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠিন ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতকে, অর্থাৎ হক আদায় না করে কুরআন তিলাওয়াতকে, কুরআনকে অস্বীকার করার মতো গুনাহের কাজ বলা হয়েছে।

৬. কুরআন নাযিলের বা পড়ার উদ্দেশ্য সাধন হয় না এমনভাবে কুরআন পড়াকে (অর্থাৎ অর্থ না বুঝে বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়াকে) কুফরী কাজ বলা হয়েছে এবং যারা তা করবে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম বলা হয়েছে।

৭. না বুঝে তাড়াতাড়ি কুরআন পড়াকে বা না বুঝে তাড়াতাড়ি খতম দেয়ার চেষ্টা করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

৮. না বুঝে কুরআনের আয়াত বা পুরো কুরআন মুখস্থ রাখাকে গাধার কাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

৯. অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে সওয়াব হয়-এমন বক্তব্য কুরআন তথা ইসলামে থাকা সম্ভব নয়।

হাদীসের তথ্যের সারসংক্ষেপ

১. জ্ঞান অর্জন হয় না, এমন লোকদের দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত লোক বলা হয়েছে।
২. যে পড়ায় জ্ঞান অর্জন হয় না, সে পড়া কিয়ামতের দিন বিপক্ষে সাক্ষী দেবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।
৩. যারা এমনভাবে কুরআন পড়বে যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন হবে না, তারা ইসলাম থেকে তীরের বেগে বের হয়ে যাবে বলা হয়েছে।
৪. যে পড়ায় জ্ঞান অর্জন হয় না সে পড়ায়, পড়া অমলটির ফরজ দিকটি অনাদায় রয়ে যায় বলে বলা হয়েছে।
৫. না বুঝে খতম দিতে নিষেধ করা হয়েছে।
৬. অর্থ বুঝে কুরআনের একটা শব্দ বা আয়াত পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি বলা হয়েছে।
৭. 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি'- কথাটা হচ্ছে একটি দুর্বল সহীহ হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা।

বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের সারসংক্ষেপ

১. অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়ে আমল তথা কাজ করতে গেলে ইসলামের মৌলিক কাজেই নানা ধরনের ভুল হতে বাধ্য। তাই অর্থ ছাড়া কুরআন পড়ায় সওয়াব তথা লাভ হওয়ার প্রশ্নই আসে না বরং তাতে মারাত্মক গুনাহ তথা ক্ষতি হওয়ার কথা।
২. অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে কুরআন পড়ার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাই তাতে সময়ের অপচয়েরও ক্ষতি হয়।

অর্থ না বুঝে কুরআন পড়ার ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

উপরে আলোচনাকৃত সকল তথ্য পর্যালোচনার পর নির্দ্বিধায় বলা যায়, অর্থ ছাড়া কুরআন পড়ার ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির চূড়ান্ত রায় হচ্ছে-

ক. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লে কুফরীর গুনাহ তথা অত্যন্ত বড় গুনাহ হবে।
খ. মাত্র দুই অবস্থায় অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে সওয়াব হবে। যথা-

১. কুরআন শুদ্ধ করে পড়া শিক্ষা করা অবস্থায়,

২. হাফিজ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কুরআন হেফ্জ করা রত অবস্থায়। কারণ, ঐ সময় অর্থ বুঝতে গেলে হেফজ করতে অনেক সময় লেগে যাবে।

না জানার দরুন অতীতে যারা অর্থ না বুঝে কুরআন পড়েছে তাদের অবস্থা ও করণীয়

ইসলামে না জানার কারণে কোন আমল না করলে বা কোন আমলের বিরুদ্ধ কাজ করলে প্রত্যক্ষভাবে (Directly) গুনাহ না হলেও পরোক্ষভাবে (Indirectly) গুনাহ হয়। কারণ, কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যই ফরজ। তাই ঐ তথ্য না জানার জন্য তার গুনাহ হবে। তাই যে ব্যক্তিরা তথ্যটি না জানার কারণে অতীতে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন তাদের করণীয় হবে-

১. খালেস নিয়াতে ঐ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া (তওবা করা)।

২. জীবনের বাকি সময় অর্থ ছাড়া কুরআনের একটি শব্দও না পড়া। আর এ লক্ষ্যে-

   ক. মাতৃভাষায় লেখা কুরআনের তরজমা ও তাফসীর ক্রয় করে অধ্যয়ন শুরু করা।

   খ. কুরআন পড়ে সরাসরি বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে আরবী ভাষা শিক্ষা শুরু করা।

আর যারা মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় আগে তওবা করে কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নিয়ে অর্থসহ বা বুঝে কুরআন পড়ে যেতে পারেননি, তাদের মধ্যে যাদের কোন অক্ষরজ্ঞান অর্জন করার সুযোগ হয়নি, তাদের হয়তো আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা শিক্ষিত ছিলেন এবং বিবেক-বুদ্ধির ১০০% বিরুদ্ধ বলে অন্য কোন বই অর্থ ছাড়া পড়েনি, আল্লাহ তাদের মাফ না করারই কথা।

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে মুসলমানদের বেশি করে আকৃষ্ট করার জন্য করণীয়

অনেকে বলে থাকেন, কুরআনকে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়তে নিরুৎসাহিত করে এমন কথা বললে, কুরআন পড়া লোকের সংখ্যাই কমে যাবে। তাই তা বলা উচিত নয়। কথাটা শুনে মনে হয় কল্যাণকর। কিন্তু আসলেই কি তাই? চলুন, এ বিষয়টাও একটু খতিয়ে দেখা যাক-

মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় জন্য রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামগণ কেউই কুরআন না বুঝে পড়তেন না। তাহলে কুরআন অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়ার পদ্ধতিটা চালু হয়েছে সাহাবায়ে কিরামগণের পরের স্তরে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সাহাবায়ে কিরামগণের পরে এসে কুরআন পড়ার ব্যাপারে যত কথা চালু হয়েছে, তার পেছনে হয়তো উদ্দেশ্য ছিলো- মানুষকে বেশি বেশি কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করা। আর ঐ ধরনের যে প্রধান কথাগুলো মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চুল হয়েছে এবং চালু আছে, তা হচ্ছে-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা অন্যান্য ফরজ কাজের সমান বা কম গুরুত্বপূর্ণ একটা ফরজ কাজ।
২. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ নয়।
৩. অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি।
৪. অর্থসহ কুরআন পড়লে আরো বেশি নেকি।

আজ ১৪০০ বছর পরে এসে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে উপরের কথাগুলোর ফলাফল যা হয়েছে তা হচ্ছে-

১. অনেক মুসলমান কুরআন পড়তেই পারেন না,
২. যারা পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশেরই কুরআন পড়া সহীহ হয় না,
৩. যারা সহীহ করে পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশেরই কুরআনের জ্ঞান নেই। কারণ তারা অর্থছাড়া কুরআন পড়েন।

সাহাবায়ে কিরামদের পর চালু হওয়া উপরোক্ত কথাগুলোর ফল এরকম হওয়ারই কথা। কারণ তা কুরআনের জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়

বরং বিপরীত। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন আমল বা কাজ আল্লাহ যেভাবে পালন করতে বলেছেন, কল্যাণের কথা ভেবেও যদি সেটা অন্যভাবে পালন করতে বলা হয় বা পালন করা হয়, তবে তাতে যে অকল্যাণসমূহ হবে তা হচ্ছে-

ক. অজান্তে আল্লাহর আদেশ অমান্য করাকে উৎসাহ দেয়া হবে,

খ. যে কল্যাণমূলক ফলাফলের জন্য আল্লাহ আদেশটা দিয়েছেন তা কখনই পাওয়া যাবে না। সে ফলাফল দুনিয়া বা আখিরাতে যেখানেই হোক না কেন।

গ. আমলটা যদি মানুষ গঠনমূলক হয় তবে যে মানের জনশক্তি আল্লাহ ঐ আমলের দ্বারা তৈরি করতে চেয়েছেন, সে মানের জনশক্তি কখনও গঠিত হবে না। আর এটাতো স্বতঃসিদ্ধ (Universal Truth) কথা যে, অনেক সংখ্যক পঙ্গু মানুষের চেয়ে একজন সুস্থ-সবল মানুষ সমাজের জন্য বেশি কল্যাণকর।

ঘ. আল্লাহর দেয়া চিরসত্য পথ বা পন্থা পাল্টাতে গেলেই নানা ধরনের ভ্রান্ত দল-উপদলের সৃষ্টি হবে।

তাই কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে মুসলমানদের বেশি করে আকৃষ্ট করার জন্য যা করতে বা বলতে হবে তা হল–

ক. সকল মুসলমানের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এক নাম্বার সওয়াবের কাজ অর্থাৎ নামাজ পড়ার চেয়েও বেশি সওয়াবের কাজ এবং তা না করা সব চেয়ে বড় গুনাহ অর্থাৎ নামাজ না পড়ার চেয়ে অনেক বড় গুনাহের কাজ,

খ. কুরআনের একটি শব্দ বা আয়াত বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকি

গ. কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আরো বড় সওয়াবের কাজ,

ঘ. যে সকল মুতাশাবিহাত আয়াতের অর্থ হয় না সেগুলো বাদে অন্য কোন আয়াত 'ইচ্ছাকৃতভাবে' অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া পড়া, অতিবড় গুনাহের কাজ।

(কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধিগ্রাহ্য এই তথ্যগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। যে কোন কারণেই হোক ইসলামী জীবন বিধানের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের একেবারেই অগোচরে চলে গেছে)

ঙ. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করলে কী কী লাভ বা কল্যাণ হবে তা মুসলমানদের বেশি বেশি করে জানাতে হবে। আর এই লাভ বা কল্যাণের বর্ণনার সময় দুনিয়ার কল্যাণগুলো পরকালের কল্যাণের আগে বলতে হবে। কারণ মানুষের জন্মগত স্বভাব হচ্ছে, তারা দুনিয়ার কল্যাণ বা নগদ কল্যাণটা আগে দেখতে বা পেতে চায়। আর তাই সূরা বাকারার ২০১নং আয়াতে আল্লাহ্ এভাবে দোয়া করতে শিখিয়েছেন–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর।

ব্যাখ্যা: লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহ্ দুনিয়ার কল্যাণ আগে চাইতে বলেছেন। কারণ তিনি তো তাদের সৃষ্টিগত স্বভাবটা সব চেয়ে ভালো জানেন। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সা. এই দোয়াটাই সব চেয়ে বেশি করতেন বা সব চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অধিকাংশ ওয়াজকারীগণ এবং ইমাম সাহেবরা ইসলামের কোন আমল বা কাজের, লাভ বা কল্যাণের কথা বলার সময়, মানুষের জন্মগত ঐ স্বভাব এবং তার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসের ঐ উপদেশকে গুরুত্ব দেন না। কোন আমলের লাভ বা কল্যাণের বর্ণনা করতে যেয়ে তারা প্রায় সমস্ত সময়টুকু ব্যয় করেন পরকালের কল্যাণ বর্ণনা করতে এবং তারও অধিকাংশ

সময় তারা ব্যয় করেন হুর-পরী, ঘুমাবার গদির (Matress) উচ্চতা ইত্যাদি বর্ণনা করতে।

❑❑ কুরআনের জ্ঞান অর্জনের লাভ বা কল্যাণের কথা বর্ণনা করার সময় প্রধান যে দুটো বিষয় বলতে হবে, তা হচ্ছে-

ক. মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক আছে, যথাঃ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। এই সকল দিকের চিরসত্য প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় কুরআনে আল্লাহ্ বর্ণনা করে রেখেছেন। মানব সভ্যতার উন্নতি করতে হলে ঐ সকল দিকের উন্নতি অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেই উন্নতি করতে হবে কুরআনে বর্ণনা করা মৌলিক বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে। তা না হলে সেই উন্নতি আপাতত যতই কল্যাণকর মনে হোক না কেন, একদিন তা অবশ্যই অকল্যাণকর প্রমাণিত হবে বা ভেঙে পড়বে। এর ভূরি ভূরি উদাহরণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে আছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা। ৭৫ বছর চলার পর তা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আর তাই পবিত্র কুরআনের সূরা নাহল-এর ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন-

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

অর্থ: অতএব, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখ। অমান্যকারীদের পরিণাম কী হয়েছে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ এখানে মানুষকে বলছেন, তোমরা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখ কুরআনের মৌলিক তথ্যের উপর ভিত্তি না করে যারা তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতি করার চেষ্টা করেছে, তারা কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

খ. কুরআনের বক্তব্যগুলো যে জানে শয়তান তাকে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে অন্তত ধোঁকা দিতে পারবে না। কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই, ছোট শয়তানও তাকে সহজে ধোঁকা

দিয়ে, ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় থেকেও বিপথে নিয়ে দোযখে পৌঁছে দেবে। শয়তান যে এটা করছে, সে তা বুঝতেও পারবে না। আর এই ধোঁকা শয়তান দিবে ওলি, পীর, বুজর্গ, মাওলানা, হুজুর, চিন্তাবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ইত্যাদির বেশে এসে এবং সওয়াব বা কল্যাণের কথা বলে।

ইসলামের সকল আমল বা কাজের প্রতি মানুষকে অধিক আগ্রহী করার জন্য উপরের কর্মপদ্ধতিই সকলের গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, আশা করি আপনাদের নিকট এখন পরিষ্কার যে, 'অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি' কথাটার উৎস হচ্ছে একটা 'দুর্বল' হাদীসের কুরআন, অন্যান্য শক্তিশালী হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির ঘোর বিরোধী 'ভুল ব্যাখ্যা'। কুরআনের ব্যাপারে এরকম আরো কিছু অসতর্ক ও মহাক্ষতিকর প্রচারণা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু আছে। সেগুলো শনাক্ত করা সহজ হবে যদি আমরা নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখি-

১. শয়তানের এক নম্বর কাজ হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখা।
২. শয়তান সব সময় কল্যাণ, সওয়াব বা লাভের লোভ দেখিয়ে ধোঁকা দেয়। আর তার এই পদ্ধতি যে কত মারাত্মক তা বুঝা যায় বেহেশতে আদম (আ.) এর ধোঁকা খাওয়ার ঘটনা থেকে
৩. মুতাশাবিহাত আয়াতের বক্তব্য ও রাসূল (সা.) এর মু'জিজা ব্যতীত, চিরন্তনভাবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী কোন বিষয় কুরআন ও সহীহ হাদীস নেই। দু'একটা মানুষের বর্তমান জ্ঞানে বুঝে না আসলেও পরে তা অবশ্যই বুঝে আসবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব কোন মতামত আপনাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার মত কোন অবস্থানেও আমি নেই। আমি ঐ ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যগুলো শুধু আপনাদের সামনে হাজির করে দিয়েছি। আশা করি, ঐ তথ্যগুলো জানার পর যে কোন বিবেকসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া

কুরআন পড়লে, সওয়াব হবে না গুনাহ হবে-সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছা মোটেই কঠিন হবে না।

যে সকল মহান ব্যক্তি ইসলামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন, তাঁদের নিকট আমার আকুল আবেদন, তাঁরা যেন পুস্তিকার উল্লেখিত তথ্যগুলো সামনে রেখে বিষয়টা পর্যালোচনা করে হতভাগ্য মুসলমান জাতিকে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন।

আমি সকল মুসলমান, বিশেষ করে যারা কুরআন ও হাদীসের বিশেষজ্ঞ, তাঁদের নিকট আকুল আবেদন করছি, আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কারো নিকট কোন ভুল ধরা পড়লে বা কারো যদি আর কোন তথ্য জানা থাকে তবে তা আমাকে জানাতে। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো ব্যাখ্যাসহকারে সংযোজন করব ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কুরআনের ব্যাপারে সকল অসতর্ক ও ক্ষতিকর কথা শনাক্ত করার ক্ষমতা ও সুযোগ দান করেন এবং সে অনুযায়ী আমাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নেয়ার তৌফিকও দান করেন, আমিন!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?

২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. 'শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?
২৯. ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে

লেখক পরিচিতি

ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমানের জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরাজি-ডুমুরিয়া গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবন আরম্ভ। ছয় বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তাঁকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ডুমুরিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তিনি যথাক্রমে ডুমুরিয়া হাইস্কুল ও সরকারী বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে MBBS পাস করেন। দ্বিতীয় ও ফাইনাল প্রফেশনাল MBBS পরীক্ষায় তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করেন।

MBBS পাস করে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৭৯ সালে ইরাক সরকারের চাকুরী নিয়ে সেদেশে চলে যান। চার বছর ইরাকের জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে চাকুরী করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৮৬ সালে গ্লাসগো রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে জেনারেল সার্জারিতে FRCS ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে কনসালট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর অব সার্জারি এবং ল্যাপারোস্কোপ (Laparoscope) যন্ত্রের দ্বারা পিত্ত-থলির পাথর (Gall Bladder Stone) অপারেশনে, একক হাতে (Single handed) করা, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ সার্জন (Surgeon)।